(১) রোমান্স (Romance)-ধর্মী উপন্যাস : মধ্যযুগে ইওরোপের বিভিন্ন ভাষায় পদ্যে ও গদ্য আখ্যানে প্রেম-শৌর্য-বীর্যের এক ধরনের মনমাতানো কাহিনি লেখা হতো যাদের বলা হতো 'রোমান্স'। পরবর্তীকালে বাস্তবজীবনের সঙ্গে দূর-সম্পর্কিত, কল্পনাশ্রয়ী প্রেম-বীরত্বের যে-কোন উপাখ্যান-ই 'রোমান্স' অভিধায় অভিহিত হতে থাকে। 'উপন্যাস' বা 'Novel'-এর চেয়ে 'রোমান্স' সময়ের বিচারেই শুধু পূর্ববর্তী তাই নয়, 'উপন্যাস' যেমন অবিমিশ্রভাবেই বাস্তবনির্ভর, 'রোমান্স' তেমনটা নয় ; সমকালীন সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রণ, বাস্তবতার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ-ই উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ; 'রোমান্স' কিন্তু অপরিচিত অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে চায় অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস আর কবিত্বময় কল্পনার উদ্ভাসে, জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতার ঊর্ধ্বে দীপ্যমান মুহূর্তগুলিকে এক মায়াময় রহস্যে ধরতে চায় যেন। 'উপন্যাস' ও 'রোমান্সের' মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা এই বাস্তবগুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে। 'জীবনমুখিতা' তথা 'বাস্তবানুগামিতা' যদি উপন্যাসের প্রধান মাপকাঠি বলে মনে করা হয়, তাহলে 'রোমান্স'-কে পৃথক আসনে বসানো সঙ্গত। তবে মধ্যযুগীয় রোমান্স যেরকম বাস্তব সম্পর্করহিত, বীরত্বব্যঞ্জক, আকাশমুখী কল্পকাহিনি, আধুনিক 'রোমান্স' বা রোমান্সধর্মী উপন্যাস তেমন নয়। এ-প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান অভিমত উদ্ধার করছি :

> "আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ... রোমান্স লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মতো সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে।"

এই মন্তব্যের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* ও *কপালকুণ্ডলা*—এই দুটি রোমান্সধর্মী উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্বের এক অসামান্য মাইলফলক। শ্রীকুমারবাবুর ভাষায়, "...দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" বাস্তবিকই কল্পনা ও বাস্তব, রোমান্স ও ইতিহাসের অভিনব সমন্বয়ে *দুর্গেশনন্দিনী* এক যুগান্তকারী রচনা। ইতিহাসের ঘটনাবহুল ও বহুবর্ণরঞ্জিত ক্ষেত্রভূমি থেকে কাহিনি ও চরিত্রগুলিকে আহরণ করলেও ঐতিহাসিক বাস্তবতা কিংবা প্রতিবেশসৃষ্টি বঙ্কিমের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো না। ঐতিহাসিক সংঘাতের প্রেক্ষিতে *দুর্গেশনন্দিনী* এক রোমান্টিক উপন্যাস। মোগল-পাঠানের যুদ্ধবৃত্তান্ত এখানে আঁকা হয়েছে আবছাভাবে ; ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি—মানসিংহ, জগৎ সিংহ, কতলু খাঁ প্রভৃতি—তেমন গভীরভাবে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়নি ; ইতিহাসের কাঠামোয় কল্পনা ও আবেগের উদ্দীপনা ও রং-এর বিন্যাসে ইতিহাসের অশ্বকে রোমান্সের রাজপথে ছুটিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

Scanned with CamScanner

তাঁর বাল্যকালে খুল্লপিতামহের কাছ থেকে পাঠানদের হাতে গড় মান্দারণ দুর্গের পতন ও জমিদারের স্ত্রী-কন্যাদের বন্দি হওয়ার যে কাহিনি শুনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকেই গড়ে উঠেছিল দুর্গেশনন্দিনী-র পটভূমি। ঐতিহাসিক সঙ্কটের বিপর্যয়কর মুহূর্তে এক সাধারণ দুর্গস্বামীর ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনি অসম্ভব দ্রুতগতিতে এক অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে পৌঁছেছে। দুর্গজয়ের বর্ণনা, বীরেন্দ্র সিংহের বিচারদৃশ্য, কতলু খাঁ-র হত্যার বিবরণ, কারাগারে আয়েষার প্রেমের বিকাশ ইত্যাদিতে বঙ্কিমের কবিকল্পনা ও রোমান্সরসিকের দৃষ্টি সহজেই নজরে পড়ে। প্রেমের অনিবার্যতা, সম্পর্কের জটিল রহস্যময়তা, আবেগের আতিশয্য, বাস্তবতার চিত্রণে অতি-প্রাকৃতের ছায়াপাত, স্বল্প-সংকেতের মধ্যমে কল্পলোকের গূঢ়তা ইত্যাদি দুর্গেশনন্দিনী-কে সার্থক রোমান্সধর্মী উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করেছে।

কিছু বাস্তব ঘটনা বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা-র পটভূমি নির্মাণে সহায়ক হলেও এখানেও ঔপন্যাসিকের কবি-কল্পনা ও রোমান্সরসিক দৃষ্টি কাহিনি ও উপন্যাসের রূপরীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দুর্গেশনন্দিনী-তে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে রোমান্সের সঞ্চার দেখা গিয়েছিলো তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণতায় বিকশিত হতে পেরেছে কপালকুণ্ডলা-য়। গভীর সমুদ্র আর বিজন অরণ্যভূমির ঘোর-কাপানো আশ্চর্য পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা 'সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তি'। বঙ্কিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নায়িকা-চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মনে এক অস্পষ্টতা ছিলো। কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানায় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র ও অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বঙ্কিম—"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপলিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" দীনবন্ধু মিত্র এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। সঞ্জীবচন্দ্রের উত্তর ছিল যে, অরণ্য ও পালকপিতার প্রভাবে সেই নারী কিছুকাল ঘোরের মধ্যে থাকলেও ক্রমে স্বামীপুত্র নিয়ে সংসার ও সমাজে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত বঙ্কিমের মনঃপুত হয়নি। তাঁর কপালকুণ্ডলা-য় তিনি এ'প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন অন্যভাবে।

প্রচলিত অর্থে যাকে সমাজ-সংসার বলি তাঁর থেকে দূরে নিঃসঙ্গ-গম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশে যার বাল্য ও কৈশোর কেটেছিলো সেই কপালকুণ্ডলা যখন সমুদ্রতীরে এক চকিত দেবমূর্তির মতো আবির্ভূতা হয়ে যুবক নবকুমারের প্রশ্ন করে, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' তখনই রোমান্সের রহস্যমণ্ডিত প্রেমনাধুর্যের অন্তর্নিহিত সুরটি অনুরণিত হয়ে ওঠে যেন। সেই নারী সংগঠিত বৃহত্তর সমাজে এলে তার ফলাফল কি হতে পারে বঙ্কিম তাই দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলা-য় তিনি সম্মোহনের আবরণ ছিন্ন করে সেই নারীকে তার সম্পূর্ণ মানসীরূপে জেগে উঠতে দেননি। পুরুষের আকর্ষণ, স্বামীপ্রেম, সন্তানসন্ততির দায়-দায়িত্ব-ভালোবাসা যদি কপালকুণ্ডলার নির্বেদ ভেঙে ফেলতে পারতো, তাহলে রোমান্সের সহজ, একমাত্রিক সমাধানের বদলে বাস্তবজীবনের বহুমাত্রিক জটিলতার পরিচয় পাওয়া যেত, উপন্যাসে যেমনটা বাঞ্ছিত। সমাজবাস্তবতা যদি বঙ্কিমের ভাবনায় যথাযথ গুরুত্ব পেতো, কপালকুণ্ডলার বিবাহপূর্ব থমথমে অলৌকিক পরিবেশ আর বিবাহোত্তর সমাজসংসারের চিত্রটি সমান গুরুত্বের সঙ্গে যদি বিবেচিত হতো তাহলে এক রহস্যময়ী অরণ্যনারীর ছায়াসংসারের মায়াবী ঔদাসীন্যে উপন্যাসটি শেষ

হতো না। তখন রোমান্স ও উপন্যাসের মিশ্রণ না বলে কপালকুণ্ডলা-কে পুরোপুরি উপন্যাসই বলা যেতে পারতো।

দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসদুটির সাধারণ পরিচয় যথাক্রমে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' ও 'কাব্যিক রোমান্স'। ঐতিহাসিক রোমান্সে উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রাবলী সংগৃহীত হয় ইতিহাসের ক্ষেত্রভূমি থেকে, কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতা ও বিশ্বস্ততার চাইতে তার আলো-আঁধারি, আবেগ ও কল্পনার উদ্দীপনা এবং কর্মমুখরতাই উপন্যাসে প্রাধান্য পায়। দুর্গেশনন্দিনী-তে ইতিহাসকে ছাপিয়ে উঠেছে দুর্গস্বামীর ভাগ্যের ইতিবৃত্ত। কপালকুণ্ডলা-য় ইতিহাসের ছোঁয়া থাকলেও তা মূলত কাব্যিক রোমান্স। ভাষার কাব্যিকতা ছাড়াও এ-বইয়ের কাহিনি সম্ভাব্য ঘটমানতা অতিক্রম করে এক কল্প-সম্ভাব্যতায় উপনীত হয়। নির্জন সমুদ্রতীরে কাপালিক-প্রতিপালিতা সুন্দরী কপালকুণ্ডলা ও সহযাত্রী-পরিত্যক্ত পথিক নবকুমারের পরিচয় ও প্রণয়ের কাহিনি ঘটমানতার নিরিখে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বঙ্কিম তাকে আড়াইশো বছর পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে রোমান্সের বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে চেয়েছেন।

(২) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস (Autobiographical Novel) : লেখক যখন তাঁর হারানো দিনের অভিজ্ঞতা, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে পাঠকের সঙ্গে গড়ে তোলেন এক নিবিড় পরিচয় তখন আমরা পাই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের সৃজিত জগতে সঞ্চরমান পাত্রপাত্রীরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলে যেতে থাকে আর তার মধ্যে দিয়েই উন্মোচিত হতে থাকে লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা দিক। এমন সব বিষয় ও ঘটনা যা গোপন থাকে প্রকাশ্য জীবনের আড়ালে, সেসব কিছু উপন্যাসের নিজস্ব ধর্মে উত্তীর্ণ হওয়া চাই ; আত্মজৈবনিক উপন্যাস লেখকের আত্মসর্বস্বতার তাড়নায় নিছক ডায়েরিতে পর্যবসিত হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় ; ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সংযোগে ব্যক্তিজীবনের উন্মোচন হওয়া চাই উপন্যাসশিল্পের রূপ ও শৈলীর শর্তসমূহ মেনে।

ইংরেজিতে ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড, লরেন্সের সন্স্ অ্যান্ড লাভার্স, বাংলায় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী ইত্যাদি উপন্যাসকে এই শ্রেণীর রচনা বলে মনে করা হয়।

প্রথমেই ডেভিড কপারফিল্ড প্রসঙ্গে আসি। ডিকেন্সের এই অতি-জনপ্রিয় উপন্যাসটি অবশ্যই আত্মজীবনীমূলক। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ডেভিড কপারফিল্ড-এর নামের আদ্যাক্ষরগুলি (D. C.) উল্টে দিলেই পাওয়া যায় গ্রন্থকার অর্থাৎ চার্লস ডিকেন্সের নামের প্রথম অক্ষরদুটি (C. D.)। ডিকেন্সের প্রতিরূপ ডেভিড উত্তম পুরুষ বর্ণনারীতিতে যে দীর্ঘ আখ্যানভাগ রচনা করেছেন তা ডিকেন্সের জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ঘটনাক্রমের এক চমকপ্রদ উপন্যাস-রূপ। এক মর্মস্পর্শী bildungsroman ডেভিডের স্মৃতি রোমন্থন ও তা লিপিবদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে ডিকেন্স তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাগুলিকে পাঠকদের দরবারে হাজির করেছেন। ডেভিড তার কাহিনী সম্পর্কে বলেছিলো—'this narrative is my written memory' ; ডিকেন্সের উপন্যাসটি সম্পর্কে এই 'written memory' কথাটিই প্রযোজ্য। সর্বতোভাবে

ডিকেন্স আত্মজীবনী লেখার যে পরিকল্পনা করেছিলেন বন্ধু ফরস্টারের পরামর্শে সে পরিকল্পনা বাতিল করে তিনি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে ডেভিড কপারফিল্ড সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দুর্বলতার কথা তিনি ব্যক্তও করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

এই উপন্যাসের অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র, দেনার দায়ে কারারুদ্ধ অথচ নির্বিকার জীবনরসিক মি. মিকবার ও তার পতিপ্রাণা পত্নী মিসেস মিকবার বস্তুতপক্ষে ডিকেন্সের পিতা-মাতার প্রতিরূপ। ডেভিডের মতোই ডিকেন্সের স্কুল যাওয়া ও লেখাপড়া নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছিলো, ধারকর্জ শোধ করতে না পেরে জন ডিকেন্স কারান্তরালে গেলে বালক চার্লসকে ডেভিডের মতোই কারখানার কালিমাখা অন্ধকারে ঢুকতে হয়েছিলো। পরে চার্লসকে পাঠানো হয়েছিল যে 'ওয়েলিংটন হাউস অ্যাকাডেমি'তে তাকে ড. ব্রিস্কল-শাসিত 'সালেম হাউস'-এর সঙ্গে মেলাতে অসুবিধা হয় না। এছাড়া মারিয়া বিডনেল-এর সঙ্গে ডিকেন্সের প্রেম-সম্পর্ক ও তার ব্যর্থতা, ক্যাথেরিন হগার্থের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ, লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ইত্যাদি ডিকেন্সের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ঘটনাই স্থান পেয়েছে উপন্যাসের কাহিনিতে।

এই উপন্যাসের নায়কচরিত্র ডেভিডের আড়ালে ডিকেন্সকে চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না। উপন্যাসের অন্য অনেক চরিত্র ও ঘটনাপঞ্জীও লেখকের জীবন থেকে নেওয়া। এক গভীর মমত্ববোধ সেইসব চরিত্র ও ঘটনাকে দিয়েছে চমৎকার সজীবতা। তবু এ-উপন্যাসে এমন অনেক চরিত্র ও ঘটনা ভিড় করে এসেছে যাদের সঙ্গে ডিকেন্সের ব্যক্তিজীবনের কোন সংশ্রব নেই। কল্পনাশক্তি ও গল্পবলার সম্মোহক দক্ষতায় ডিকেন্স তাঁর ব্যক্তিজীবনের স্মৃতি-রোমন্থনে যুক্ত করেছেন এক স্বতন্ত্র মাত্রা যাকে বলা হয়েছে 'a mist of fancy over well-remembered facts'। এখানেই আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সার্থকতা।

চারটি পর্বে সম্পূর্ণ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-কে সব অর্থে উপন্যাস বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই গ্রন্থে লেখকের আত্মচরিতের স্পর্শ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ঘটনার অসাধারণ বৈচিত্র্য, অনুভবের গভীরতা ও অগণিত নর-নারীর সমাবেশে শ্রীকান্ত এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, যদিও গঠনশৈথিল্যের কারণে উপন্যাসের নিবিড় সংহতি সেভাবে পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকান্তের আড়ালে দেখা যায় শরৎচন্দ্রকে, তারই দৃষ্টিকোণ থেকে, তারই বয়ানে লেখক তাঁর আপন জীবন ও অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন।

শ্রীকান্ত নিজের কাহিনি শুনিয়েছে উত্তম পুরুষ বিবরণ-দাতারূপে, যা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের প্রচলিত রীতি। উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যখন মাসিক কিস্তির আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিলো ১৩২২-এর মাঘ সংখ্যা থেকে, তখন সেটির নাম ছিলো 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' এবং লেখকের নাম ছাপা হয়েছিলো 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা'। ফাল্গুন সংখ্যাতেও এই নাম ছাপা হয়। এরপর থেকেই 'শ্রীকান্ত শর্মা'র পরিবর্তে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হতে থাকে। তার বাল্য ও কৈশোরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রথম যৌবনে পদার্পণ—এই নিয়ে শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর প্রথম পর্ব। কত বিচিত্র মানুষের জীবন ও কত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাল্য ও কৈশোর থেকে যৌবনোদগমের সন্ধিতে অজস্র তরঙ্গমালায় ভেসে বেড়িয়েছে ভ্রমণকাহিনিধর্মী আত্মজৈবনিক আখ্যানের নায়ক শ্রীকান্ত। ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে সে পেয়েছে ভবঘুরে, দুঃসাহসী জীবনের দীক্ষা ; অন্নদাদিদি কিশোর শ্রীকান্তর হৃদয়ে জ্বালিয়েছে আদর্শ প্রেমের স্বচ্ছ আলো ; রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তার মনে সঞ্চার করেছে গভীর ঔৎসুক্য, যদিও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জন্মজন্মার্জিত সংস্কার।

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়বৃত্তান্ত উপন্যাসে আগাগোড়া প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য খণ্ড-আখ্যান এই মূল কাহিনির পরিপোষণে সহায়ক হয়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর কাছে আবার গেছে শ্রীকান্ত। উভয়ের প্রেম মুক্তি পেয়েছে সহজ উচ্ছ্বাস ও স্বীকারোক্তিতে।

কিন্তু শ্রীকান্ত তার সংস্কারজনিত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারেনি ; রাজলক্ষ্মী তার সঙ্গে বর্মা যেতে চাইলে শ্রীকান্ত রাজি হয় নি। শ্রীকান্তের বর্মাযাত্রা লেখকের কল্পনা ও বর্ণনাদক্ষতার সার্থক সমন্বয়ে এক আশ্চর্য মানব-অভিযান। এই বর্মাযাত্রা ও প্লেগ-মহামারীর বৃত্তান্ত শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। শ্রীকান্ত-র দ্বিতীয়পর্বে আমরা দেখি এক স্মরণীয় ও প্রতিবাদী নারী অভয়াকে। সামাজিক তথা ধর্মীয় সংস্কার প্রবলতার বিরুদ্ধে, যে কুণ্ঠা ও লজ্জা রাজলক্ষ্মীর প্রেমকে নিয়ে গেছে এক অবদমিত আবেগের আবর্তে সেই সংকোচের বিরুদ্ধে, অভয়ার বিদ্রোহ রাজলক্ষ্মীকে আলোড়িত করেছে। শ্রীকান্ত তবু তার সম্ভ্রম ত্যাগ করতে পারেনি ; রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাদ করে ফিরে এসেছে নিজের গ্রামের বাড়িতে। রাজলক্ষ্মী কিন্তু শ্রীকান্তের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কাশী থেকে উপস্থিত হয়েছে পল্লীগ্রামে অসুস্থ শ্রীকান্তের শয্যাপার্শ্বে।

তৃতীয় পর্বে প্রথম পর্বেরই যেন পুনরাবৃত্তি। দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে শ্রীকান্ত যদিও বা নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলো, রাজলক্ষ্মীর ভেতরে সেই উদ্দীপনা তখন আর নেই ; এক নির্লিপ্ততা, এক অবসাদ, সর্বত্যাগের এক অনুচ্চারিত বাসনা যেন তার পূর্বেকার সত্তাকে বদলে দিয়ে। তার আজন্মের পরিবেশ ছেড়ে, শ্রীকান্তের জীবনকে মরুসদৃশ করে সে চলে গেলো কোথাকার কোন গঙ্গামাটি গ্রামে। এই পর্বে বেশ কিছু নতুন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যথা, তরুণ, সন্ন্যাসী ব্রজানন্দ, মহিমান্বিত গৃহবধূ সুনন্দা, সতীশ ভরদ্বাজ ও চক্রবর্তী গৃহিণী, যারা রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মূল কাহিনির সঙ্গে তেমন নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। ভ্রমণকাহিনির আদলে লেখা আত্মচরিতে এমন অনেক চরিত্র আসে যাদের মূল আখ্যায়িকার প্রয়োজনে আসতে হয় না। দীর্ঘায়তন, আত্মজৈবনিক রচনায় এ-জাতীয় ত্রুটি অপ্রত্যাশিত নয়।

শ্রীকান্ত-র প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের প্রথমার্ধ ভ্রমণকাহিনির দ্রুততায় এগিয়েছে। এরপর থেকেই, বিশেষত তৃতীয় পর্বে, গতিমন্থরতা, সরসতা ও মাধুর্যের অভাব টের পাওয়া যায়। চতুর্থ পর্বে মন্থরতা তথা চরিত্র ও আখ্যানের বর্ণহীনতা আরো প্রকট। এই পর্বের আরম্ভেই রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত কাহিনি একরকম শেষ। এরপর এসেছে গহর ও কমললতার খণ্ড-আখ্যান। গহর স্বভাব কবি, সরল ও উদার প্রেমিক চরিত্র ; হয়তো প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, কিন্তু উপন্যাসে প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখলে গহর এবং কমললতার কাহিনির তেমন কোন সার্থকতা নজরে পড়ে না।

ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার নিজস্ব পাদপীঠ থেকে সার্থক আত্মজৈবনিক উপন্যাসকে উত্তীর্ণ হতে হয় সর্বজনীন বিশ্বাসের উচ্চতায়। নিজত্বের বিশেষ ধর্ম থেকে চরিত্রাবলী তাদের অস্তিত্বের নির্যাস আহরণ করলেও পৌঁছে যায় সর্বজনীন উপলব্ধির বৃহত্তর বিচরণ ক্ষেত্রে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এমনটা হয়ে ওঠে না। পথের পাঁচালী-র অপু কিংবা আরণ্যক-এর সত্যচরণের বেলায় চরিত্রের নিজত্বের পাদপীঠটি বৃহত্তের বিস্তৃত অঙ্গীকারের পটভূমিতে বিলীন হয়ে যায়নি। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে এই 'প্যারাডক্স্'টি থেকেই যায়।

মোটের ওপর, একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনোযোগ ও অনুধাবন দাবি করে সেগুলি নিম্নরূপ :

ক. গ্রন্থকারের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাসমূহ কিভাবে উপন্যাসটির বিষয় ও নির্মাণের তাৎপর্য ও বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে ;

খ. নায়করূপী লেখকের গ্রন্থে বিধৃত কাহিনির গ্রন্থিমোচনে কোন্ কোন্ ঘটনা কিভাবে সহায়ক হয়েছে ;

Scanned with CamScanner

গ. স্মৃতিবাহিত ঘটনাবলী কিভাবে সংস্থাপিত ও প্রয়োজনে পরিমার্জিত হয়েছে উপন্যাসে ;

ঘ. কিভাবে লেখকের মান-অভিমান-আতুরতায় জড়ানো মনটি আড়াল হতে চাইলেও বারবার কম্পিত হচ্ছে আবেগে, স্মৃতিখণ্ডগুলির অবিরাম দোলাচল ও টানাপোড়েনে;

ঙ. কিভাবে ও কতখানি নায়করূপী লেখক চরিত্রটি ক্রমবিকশিত হয়ে পরিণতির পূর্ণ মাত্রা অর্জন করল ;

চ. মূল চরিত্রটি নিতান্তই একমাত্রিক হয়ে উপন্যাসের গঠন ও তার বিশ্বাসের স্থিতিমূল্যকে দুর্বল করে দিল কিনা...ইত্যাদি।

(৩) আঞ্চলিক উপন্যাস (Regional Novel) : সব ধরনের উপন্যাসেরই একটি বাস্তব পটভূমি থাকে যার পরিচিত চৌহদ্দীর আকার-আয়তনের মধ্যে দিয়ে লেখক খোঁজেন জীবনের ব্যাপ্তি ও গভীরতার এক দুর্জ্ঞেয় প্রতিভাস। কোন একটি বিশেষ অঞ্চল এবং তার প্রাকৃতিক, সামাজিক, মানবিক বাস্তবতা একটি উপন্যাসে স্থান পেয়েই থাকে। সেই অর্থে হয়তো প্রায় সব উপন্যাসই আঞ্চলিক উপন্যাসের অভিধা পেতে পারে। আঞ্চলিক পরিবেশ কোথাও একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করে ; আবার কোথাও দেখা যায় কোন বিশেষ অঞ্চলের জনজীবনের সামগ্রিক সত্তার এক অখণ্ড রূপ হিসেবে ঔপন্যাসিক সৃষ্ট চরিত্রগুলি 'সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে।' ইংরেজ ঔপন্যাসিক হার্ডির 'ওয়েসেক্স্' নভেলগুলির প্রকাশনার পর থেকেই বিশেষভাবে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বা 'regional novel' অভিধাটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। কোনো একটি অঞ্চল যখন এমন স্বতন্ত্র সত্তায় চিহ্নিত হয়ে যায় যে, তার ব্যাপক প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবন-জীবিকা-ভাষা-আচরণ-ভবিতব্য সব কিছু, তখন সেই অঞ্চল ও অঞ্চলসম্ভব মানবজীবনের ইতিবৃত্ত পরিচিতি পায় আঞ্চলিক উপন্যাসের অভিধায়। অ্যাব্রাম্স্ এ-ধরনের উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : "The regional novel emphasizes the setting, speech, and customs of a particular locality, not merely as local colour, but as important conditions affecting the temperament of characters, and their ways of thinking, feeling and acting."

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্র ও লক্ষণগুলি চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছেন : "এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত, সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন, অথবা কোন বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবী-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন।...প্রতিবেশ সাধারণত সকল মানুষের মনের উপরই প্রভাবশীল ; মানবজীবন লীলার স্বাধীন ছন্দও উহার নিগূঢ়, কখনও কখনও দুর্নিরীক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করিয়া থাকে। এই জাতীয় সাধারণ প্রতিবেশ-প্রভাবচিহ্নিত মানবজীবন কিন্তু আঞ্চলিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নহে।" আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম কোন দূরবর্তী জনপদ তথা প্রত্যন্তস্থিত কোন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস, বিশেষ জীবনযাপনরীতি, পরিবেশ ও চরিত্রের নিবিড় সাযুজ্যে। একটি বিশেষ স্থান-কাল-পরিবেশের ছোঁয়া, যাকে বলা হয় 'local colour' তা কিন্তু 'আঞ্চলিকতা'র এই ধারণাটি থেকে আলাদা। এ দুয়ের পার্থক্য এবং আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয় লেমন-এর সংক্ষিপ্ত টীকা থেকে : 'Generally, 'local colour' is a mildly pejorative term describing works that, however pleasant, have little value other than the portrayal of life in a given area... "regional" usually

implies a wider interest, and is occasionally used even for writers such as Hardy or Faulkner whose work tends to be centred in a particular geographical area but which also has a more general interest. But movements were influenced by and contributed to realism and its demand for literary accuracy.' (*A GLOSSARY FOR THE STUDY OF ENGLISH*)

ইংরেজি ভাষায় এমিলি ব্রন্টির *Wuthering Heights* এবং টমাস হার্ডির *The Return of the Native* আঞ্চলিক উপন্যাসের স্মরণীয় নিদর্শন। প্রথমটিতে ইয়র্কশায়ার মুরের কঠোর রুক্ষতা উপন্যাসের ব্যতিক্রমী নায়ক হিথক্লিফের আবেগ ও প্রতিহিংসা-তাড়িত নিয়তির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। আর হার্ডির উপন্যাসে অনুরূপ রুক্ষ বিস্তার নিয়ে যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্রকে ধারণ ও শাসন করেছে এগডন হিথ যার ভৌগোলিক বাস্তবতাকে ছাপিয়ে উঠেছে এক অমোঘ অতিপ্রাকৃত লীলাশক্তি, যে শক্তির হাতের ক্রীড়নক ইউস্টেসিয়া, ক্লিম ইওব্রাইট প্রমুখেরা। ইয়র্কশায়ার মুর কিংবা এগডন হিথ নিছক উপন্যাসের পটভূমি নয়, মানুষের প্রেম-বৈরিতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিপন্নতা-বিপর্যয়ের নিয়ন্তা যেন সে ; যাবতীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সকল চরিত্রের চড়াই-উতরাইয়ের সঙ্গে তার অনিবার্য যোগ।

বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আঞ্চলিকতা'র লক্ষ ও মরমী শিল্পী। রাঢ় বাংলার রুক্ষ লাল মাটির জনজীবনের কামনা-বাসনা, অন্ত্যজ মানুষদের আনন্দ-বেদনা যে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় চিত্রিত করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ধাত্রীদেবতা ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-র মতো উপন্যাসে ও অসংখ্য গল্পে, তা মানবজীবন ও আঞ্চলিক পরিবেশের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের বিরল নিদর্শন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়লাকুঠির দেশ-এ আঞ্চলিক সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং তা তারাশঙ্করকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিলো ; যদিও কয়লাখনির অপরূপ চিত্রায়ণ সত্ত্বেও শৈলজানন্দের উপন্যাসে প্রকৃতি পটভূমির চাইতে বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেনি 'আঞ্চলিকতার ভৌগোলিক একাগ্রতা, ভাবকেন্দ্রিয় লক্ষ্যভূমির আত্যন্তিকতা, মানব মনের সঙ্গে নিত্য সংযোগ, ভূমির বাইরে চরিত্র বা কাহিনীর অস্তিত্বহীনতা শৈলজানন্দে একান্তভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।' তারাশঙ্করের রচনাগুলি বাদে আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি, অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম, সমরেশ বসুর ' গঙ্গা ও প্রফুল্ল রায়ের পূর্বপার্বতী।

লক্ষ করার বিষয় যে আঞ্চলিক উপন্যাসের উদাহরণরূপে যে রচনাগুলির নাম করা হলো তার প্রায় সবকটির নামকরণে একটি বিশেষ অঞ্চল ও তার জীবনের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত। কোন নদীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর ইতিকথা, কোন বিশেষ ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা-চিহ্নিত জীবনযাপন, কোন বিশেষ পেশা তথা আঞ্চলিক জীবনাদর্শ এইসব উপন্যাসের বিষয়। নামকরণেও সেই আঞ্চলিকতার পরিচয়টি স্পষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে উপন্যাসে আঞ্চলিকতার তাৎপর্য ও সার্থকতা অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। গ্রন্থকার পদ্মা নদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক জীবন ও তার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত বেদনালেখ্য এই উপন্যাসের পাঠকদের সম্মোহিত করে। নদীর জলে ভেসে বেড়ানো মাঝিমাল্লা ও তার তীরবর্তী খাঁবরপল্লীর মানুষদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত পদ্মা উপন্যাসে চিত্রিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা, আশা ও আশঙ্কার এক দুর্জ্ঞেয় নিয়ামক। পদ্মার তরঙ্গমালাকে ঘিরে আবর্তিত এই উপন্যাসের কাহিনি এক বিশেষ অঞ্চলকে ঘিরে রচিত ; সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপনরীতি, সংকীর্ণ গ্রাম

Scanned with CamScanner

পরিধির মাঝে নিতান্ত সাধারণ মাঝি ও ধীবরদের কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-উচ্ছ্বাসের নিখুঁত চিত্রায়ণে কেতুপর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল এক উজ্জ্বল মানবিক আবেদনে দীপ্যমান এই উপন্যাসে। পদ্মার তীরবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের খণ্ডাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ভাসিত করেন এক খেয়ালী নদীর প্রতিপালন ও ধ্বংসের প্রতিস্পর্ধী ভূমিকার নিবিড় সান্নিধ্যে গড়ে-ওঠা পূর্ববঙ্গীয় এক জনগোষ্ঠীর তথা সমগ্র মানবপ্রকৃতির এক আশ্চর্য জীবননাট্য। একটি বিশেষ অঞ্চলের বাস্তবতা, ভাষা, আবেগ-সংবেগের খণ্ডবৃত্তে ধরা পড়ে মানববিকাশের এক বিস্তৃত বলয়।

ওপরে বিশাল আকাশ, আর তার নীচে পদ্মার ঢেউয়ে ভাসতে থাকা মাছ ধরার নৌকাগুলি, পদ্মা ও তার খালগুলিকে অবলম্বন করে চলতে থাকা মাঝি ও জেলেদের জীবিকা ও জীবনচক্র, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, প্রেম ও আসক্তিকে আঁকড়ে ধরে আন্দোলিত জীবনধারা আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমাকে অতিক্রম করে জীবনের বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটটিকে আভাসিত করে তোলে। সার্থক জীবনশিল্পীমাত্রেই পরিচিত জগতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হন বিশ্ব মানবিকতার ব্যাপ্তিতে।

পদ্মার তীরবর্তী জনপদের ধীবরপল্লীতে ঢুকলে কুবের-ধনঞ্জয়-গণেশদের জীবনবাস্তবের চিত্রটি ক্রমে পরিস্ফুট হয়। ধনঞ্জয়ের মতো যাদের নৌকো বা জালের সংস্থান আছে তাদের বাদ দিলে বেশীরভাগ মানুষই এখানে ক্ষুধা ও ব্যাধির তাড়নায় অসহায়, অস্থির ; পদ্মার দুর্বার জলস্রোতের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে তারা বিপর্যস্ত। লেখকের সর্বাধিক সাফল্য এই দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদের জীবনালেখ্য নির্মাণে। কোনো কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় নয়, পূর্ববঙ্গের কৃত্রিমতাবর্জিত কথ্য ভাষায়, নিখুঁত বাস্তবতার পরিমিতি বোধে মানিক অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন প্রমত্ত পদ্মার তীরবর্তী মানুষদের সুখ-দুঃখ এবং পদ্মার প্রতিপালন-বিনাশের এক আশ্চর্য ইতিবৃত্ত।

ধীবরপল্লী ও কেতুপুরের জনপদজীবনই পদ্মা নদীর মাঝি-র প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে। উপন্যাসের শেষ পর্বে এসেছে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের প্রসঙ্গটি—সমুদ্র-পরিবেষ্টিত যে নির্জন দ্বীপটি পদ্মার মাঝি-জেলে-জনপদবাসীদের কল্পনায় যুগপৎ আশা ও আশঙ্কার এক অদ্ভুত আলেয়া। রহস্যাবৃত হোসেন মিয়ার মতোই রহস্যমণ্ডিত ময়নাদ্বীপ যা দূরবর্তী অগ্নিশিখার মতো আকর্ষণ করে পদ্মার পাড়ে বাস করা সরল, অশিক্ষিত মানুষদের, প্রলুব্ধ পতঙ্গের মতো তারা ঝাঁপ দিতে চায় সেই অগ্নিসংকেতের ভয়াবহ রমণীতায়। হোসেন ও তার ময়নাদ্বীপ পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের জীবনে আবির্ভূত হয় মূর্তিমান নিয়তি রূপে। পদ্মার বিস্তার ও তার তীরবর্তী অসংখ্য মানুষের জীবনের পরিপূরক যেন এই আদিম দ্বীপখণ্ড 'ময়নাদ্বীপ', যাকে ভাষার সজীবতা ও বর্ণনার অনুপুঙ্খে মানিক দিয়েছেন অসম্ভব এক বিশ্বাস্যতা।

উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক। একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ নানা উপভাষার মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠতে পারেনি। সেদিক থেকে এই উপন্যাসের ভাষা সংকীর্ণ অর্থে আঞ্চলিক নয়। কুবের-মালা-কপিলা-রাসু-পীতম-আমিনুদ্দিরা কথা বলে ঢাকা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষায় ; আবার নোয়াখালির মানুষ হোসেন মিয়া নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কখনো বা বিচিত্র মিশ্র উপভাষায় কথা বলেছে। পদ্মা নদীর মাঝি যে নিছক আঞ্চলিক উপন্যাস নয় তা প্রমাণিত হয় তখন, যখন কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ পর্যন্ত এই উপন্যাসের বিস্তারের পাশাপাশি কুবেরের ভাষা থেকে হোসেন মিয়ার ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের সীমানাকে সম্প্রসারিত করে তোলে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্মরণীয় উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম আঞ্চলিক উপন্যাসের আর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। চলমান মন্থর নদী তিতাস ও তার তীরবর্তী বসবাস করা মালোপাড়ার মানুষদের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার ইতিবৃত্ত অসম্ভব কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। মানিকের পদ্মার বৃত্তান্তে যার সূচনা সেই নদী-মাটি-মানুষের এক ও একাকার হয়ে ওঠার কাহিনিই তিতাস একটি নদীর নাম।

অঞ্চল ও আঞ্চলিকতা কিভাবে এ ধরনের উপন্যাসে সর্বব্যাপী চেহারা নেয় তার সূত্র মেলে মার্টিন গ্রে'র মন্তব্যে : "A novel which emphasises and documents the geography, customs and speech of a particular place, with a more serious explanatory focus than for mere background information. The environment is often used to explain the character and actio us of its inhabitants."

(৪) **ঐতিহাসিক উপন্যাস (Historical Novel) :** সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রকে আশ্রয় করে তাঁর অতীতচারী কল্পনায় ঔপন্যাসিক রচনা করেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের অন্তর্লোকে উঁকি দিয়ে একটি বিশেষ যুগ ও তার কিছু নির্বাচিত ঘটনা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশার ছায়াচ্ছন্ন দর্পণে ঔপন্যাসিক দেখে নেন নিজের ভাবভাবনা ও সমসময়ের মুখটিকে।

'ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। তথ্য-বিশেষ বা তথ্য-সত্যকে প্রকাশ করাই ইতিহাসের লক্ষ্য। অন্যপক্ষে, কাব্য তথা সাহিত্য তথ্যকে নির্বিক্ত করে কল্পনায়। ইতিহাস 'বিশেষ' (Particular)-কে গ্রহণ ও ব্যক্ত করে ; সাহিত্য 'বিশেষ'কে দেয় 'নির্বিশেষ' বা 'সামান্য' (Universal) সত্যের মর্যাদা। অ্যারিস্টটল এই কারণে 'কাব্য' বা 'সাহিত্য'কে ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই পার্থক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে উপন্যাসে ইতিহাসের নিছক যান্ত্রিক ও তথ্যনির্ভর কাহিনি ও চরিত্রের বিবরণ বাঞ্ছনীয় নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাই ইতিহাসের তথ্যসত্যকে জারিত হতে হবে সৃজনী কল্পনার প্রণরসে। ইতিহাস ও সৃজনশীল সাহিত্যের এই চমকপ্রদ পরিণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ অর্থবহ ; 'ইতিহাস পড়িব, না আইভানহো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই-ই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভানহো পড়ো।...কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।' ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস হওয়াটা প্রাথমিক নয়, তার উপন্যাস হয়ে ওঠাটাই বেশি জরুরি। তবে ইতিহাসের তথ্য-সত্যকে অগ্রাহ্য বা বিকৃত করলেও তার চলে না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার সুবিধার্থে তালিকাবদ্ধ করা যাক :

১. সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু ও বাস্তব চরিত্রসমূহের পরিবর্তে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপন্যাসকার বেছে নেন অতীত ইতিহাসের কোন বিশেষ একটি সময়পর্ব যার প্রতি প্রকাশ পায় লেখকের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রেমমুগ্ধতা।

২. উপন্যাসে বর্ণিতব্য যুগ তথা ঘটনা-কাহিনির প্রতি তাঁকে বিশ্বস্ত থাকতে হয়। সেই সময়কালের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার-সংস্কার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে উপন্যাসলেখককে সচেতন থাকতে হয় ; অন্যথায় তাঁর উপন্যাসটি প্রকৃত ঐতিহাসিক বাস্তবতা অর্জনে ব্যর্থ হবে 'কালানৌচিত্য' (Anachronism) দোষের কারণে।

৩. ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তথা প্রধান কুশীলব সকলেই ইতিহাসের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কেউ আপন কীর্তির বলে কীর্তিমান ; আবার কেউ অপকীর্তির দরুন অপযশপ্রাপ্ত, নিন্দিত। এইসব চরিত্রের রূপায়ণে ঔপন্যাসিককে ইতিহাসের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

Scanned with CamScanner

৪. অবশ্য কালবিরোধগত দোষের আশঙ্কা সত্ত্বেও শিল্পগত প্রয়োজন বা মূল্যের তাগিদে ঔপন্যাসিক কিছু কিছু উদ্ভাবন ও পরিবর্তন করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত— 'উপন্যাসে লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।' ইতিহাসের কাহিনির পাশাপাশি তাই স্থান পায় কাল্পনিক কাহিনি।

৫. ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেও তাদের যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলা ও উপন্যাসে জীবনভাবনা ব্যক্ত করার ক্ষমতাই ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত।

৬. ঐতিহাসিক উপন্যাসের কারবার ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে আবর্তিত জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে। ইতিহাসের সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আবেগ-আলোড়ন এই জাতীয় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের দেয় বিস্তৃতি, কখনো বা অতি-মানবিক উচ্চতা।

৭. ঐতিহাসিক উপন্যাসে থাকে মহাকাব্যিক বিস্তার ; চরিত্রগুলি তাদের নিছক ব্যক্তি পরিচয়ের পোশাক খুলে ফেলে মহাকালের অঙ্গীভূত হয়ে যায় ; একটি বিশেষ স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে উপন্যাস পায় বিশ্বজনীন ব্যঞ্জনা।

৮. মহাকাব্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই হৃদ্যতার কারণেই তার ভাষাকে হতে হয় গম্ভীর ও ধ্রুপদী যাতে করে বিশেষ দেশকালের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়িয়ে কল্পনার আবিশ্ব স্পন্দিত বিস্তার মন্ত্রিত হয়ে ওঠে।

লুকাচ (Lukacs) তাঁর *The Historical Novel*-এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবির্ভাবের সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এবং উনিশ শতকের প্রারম্ভিক সময়পর্ব অর্থাৎ নেপোলিয়নের পতনের পরবর্তী বছরগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মলগ্ন বলে উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনি রচিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক রচয়িতা ওয়ালটার স্কট। *The Castle of Otranto*-র লেখক হোরেস ওয়ালপোল প্রমুখের রহস্য-রোমাঞ্চধর্মী গথিক উপন্যাসে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি স্থূল ও বাহ্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল ; কিন্তু স্কট তাঁর কবিকল্পনা ও শিল্পবোধের সমগ্রতায় দূরবর্তী এবং নাতিদূর অতীতের যে প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পুনর্নির্মাণ সম্ভব করে তুলেছিলেন তা ছিলো অভূতপূর্ব। অতীতের মনোহর স্বপ্ন, ঐতিহাসিক দুর্গ ও প্রাসাদে শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্যের অপার স্মৃতি, ঘটনার ঘনঘটা তথা চরিত্রসমূহের আবেগ-আর্তি নিয়ে এক সুরম্য, পুনরুজ্জীবিত ঐতিহাসিক চলচ্ছবি স্কটের পূর্ববর্তী কোনো উপন্যাসে সেভাবে পাওয়া যায়নি। সমকালীন ও পূর্ববর্তী প্রজন্মের লেখকদের রচনায় যখন পাওয়া যাচ্ছিলো বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর সামাজিক জীবনযাপনের খুঁটিনাটি, তখন স্কট ডুব দিয়েছিলেন অতীত ইতিহাসের বিচিত্র, দুঃসাহসিক-গভীরতায়। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড তথা মহাদেশীয় অতীত ইতিহাসের রোমাঞ্চকর অভিযান, মধ্যযুগীয় দুর্গ-প্রাসাদ-গীর্জা-সমাধিক্ষেত্র তথা গিরি-প্রান্তর-পরিখার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপন্যাসে। তথ্যের প্রামাণিকতা নিয়ে কোথাও কোথাও প্রশ্ন থাকলেও তাঁর অতীতচারী রোমান্টিক কল্পনা ও স্মৃতিমেদুরতায় যেভাবে স্কট ইতিহাস, লোকগাথা, কিংবদন্তীকে মিশিয়েছেন, মিশেয়েছেন বাস্তবতা ও রোমান্স, যেভাবে অতীত ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে বীর্যবত্তার স্পন্দিত উল্লাস অনুভূত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে তা পাঠকের কাছে এক রমণীয় অভিজ্ঞতা। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *Waverley*—স্কটল্যান্ডে সামরিক দায়িত্বে বৃত এডওয়ার্ড ওয়েভারলির প্রেম, বীরত্ব ও সংঘাতের এক চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান, বিশাল ও বিশদ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এক চমকপ্রদ ও গতিময় কাহিনি। তাঁর আর এক বহুপঠিত

উপন্যাস *Ivanhoe*, যার ঘটনাস্থল মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ড, সময়কাল সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের রাজত্ব—ইউরোপীয় ক্রুসেডের যুগ। মধ্যযুগের ইতিহাস এখানে মিশেছে অতিকথা ও রোমান্সের সঙ্গে ; দ্বাদশ শতকে স্যাকসন-নরম্যান সংঘাতের বিবরণে স্কটের কালবিরোধ দোষ ; তবু আইভান হো-র বীরত্ব এবং আইভান হো-রেবেকা-রাওএনার ত্রিকোণ প্রেম এই উপন্যাসকে দিয়েছে এক আশ্চর্য চৌম্বকশক্তি। স্কটের অপরাপর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Rob Roy, The Heart of Midlothian, Kenilworth* প্রভৃতি।

পাশ্চাত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে স্থায়ী আসন অলঙ্কৃত করে আছে ভিকতর হুগো'র *Notre Dame de Paris*, টলস্টয়ের *War and Peace*, থ্যাকারের *Henry Esmond*, বুলওয়ার লিটনের *The Last Days of Pompeii*, ফ্লবেয়ারের *Salammbo* প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র ; তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী-র পটভূমিটি ছিলো ঐতিহাসিক। এরপর মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান তথা ঐতিহাসিক চেতনার কিছু কিছু মৌল তাগিদের খোঁজ মেলে। তবে এরই মধ্যে বঙ্কিম আমাদের উপহার দিয়েছিলেন তাঁর যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ যাতে ইতিহাস উপন্যাসের স্বাভাবিক ধর্মকে বিঘ্নিত করেনি। বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, যাঁর বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মানবিকতার উন্মোচন; কল্পনায় রঞ্জিত ইতিহাস আলো-ছায়ার মায়ায় জড়ানো। বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হলো প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরিজন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাঞ্চনমালা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমি সন্ধ্যার মেঘ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পদসঞ্চার ও অমাবস্যার গান।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করার আগে এই শ্রেণীর নিদর্শন হিসেবে রাজসিংহ উপন্যাসটিকে একটু ঘতিয়ে দেখা যাক। এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখক স্বয়ং জানিয়েছিলেন—'এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম'। দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাস প্রধান বিষয় নয়, ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব ও সমস্যাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। রাজসিংহ উপন্যাসে কিন্তু ঐতিহাসিক অংশই প্রধান, ব্যক্তিগত জীবনসমস্যা ইতিহাসের অনুবর্তী ও প্রভাবাধীন। শক্তিশালী ও ঔরঙ্গী মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সাহসী ও বীর রাজা মহারাণা রাজসিংহের সংগ্রামের ঐতিহাসিক কাহিনিকে তথ্য হিসেবে গ্রহণ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মহিমান্বিত করেছেন। ইতিহাস এই উপন্যাসে যেভাবে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে নিবিড় স্পর্শে স্পন্দিত ও রোমাঞ্চিত করে তুলেছে তেমনটা বঙ্কিমের পূর্ববর্তী ইতিহাসাশ্রয়ী রচনাগুলিতে পাওয়া যায় না।

১৮৮২-তে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে মাত্র তিরাশি পৃষ্ঠার রাজসিংহ ছিলো একটি গল্প বা 'ক্ষুদ্র কথা'। ১৮৯৩-এর চতুর্থ সংস্করণে কয়েকগুণ বর্ধিত কলেবরে রাজসিংহ 'পুনঃপ্রণীত' হয় এবং এই সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা বিষয়ে লেখক তাঁর মূল্যবান মতামত দেন। হিন্দু ও মোগলদের বিবাদ যা এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ তার পরস্পরবিরোধী ও পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণসমূহ থেকে ঐতিহাসিক সত্য-মীমাংসা যে অসম্ভব সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে উপন্যাসশিল্পের মুক্ত স্বাতাবরণে নিয়ে এসেছেন। 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক সর্বত্র সত্যের

Scanned with CamScanner

শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।'—বঙ্কিমের কথাতেই তাঁর রচনার মূল সূত্রটি আভাসিত হয়।

একটি যুগের সমগ্র ইতিহাস পরিবেশন ও পর্যালোচনা করা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাই মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর-কঠিন, অথচ শক্তিমান, তীক্ষ্ণধী ও কূটনীতিজ্ঞ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুত কুলতিলক রাজসিংহের বিরোধ ও যুদ্ধকে বেছে নিয়েছেন উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে। উপন্যাসের প্রধান ঘটনা ও তার পটভূমি যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি তার মুখ্য চরিত্রগুলিও ইতিহাসের বাস্তবতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এ-বিষয়ে বঙ্কিম নিজেই বলেছেন ; "স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আচার্য যদুনাথ সরকার *রাজসিংহ* উপন্যাসের ভূমিকায় ঐতিহাসিক বিবরণে কোথাও কোথাও ছোটখাটো কয়েকটি ভুলের কথা উল্লেখ করলেও স্বীকার করেছেন, 'বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।' ঐতিহাসিক উপাদানের যে ভুলগুলি আচার্য যদুনাথ দেখিয়েছেন সেগুলি তেমন মারাত্মক ভুল নয় যে উপন্যাসের মূল কাহিনি ও প্রধান ঐতিহাসিক সত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির পাশাপাশি কিছু অপ্রধান চরিত্র এসেছে যারা অনৈতিহাসিক, যেমন যোধপুরী বেগম, মানিকলাল, মুবারক প্রভৃতি। টডের 'রাজস্থান', রবার্ট অর্মের মোগল সাম্রাজ্যের 'ইতিহাসবৃত্তান্ত', মানুচি ও কম্বর ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। তবে সকল ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য বিচার তিনি করেন নি। ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রেখে ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার স্বাধীনতাকে শিল্পের স্বার্থে ও শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে *রাজসিংহ* উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাস পাশাপাশি চলেছে, ইতিহাসের তাগিদে উপন্যাস তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে মবারক-জেবউন্নিসার কাল্পনিক প্রেমকাহিনি। দরিয়াবিবি এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রণয় উপাখ্যানটিকে বৈচিত্র্য ও জটিলতা দান করেছে। ঔরঙ্গজেব-দুহিতা বাদশাজাদী জেব-উন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও বঙ্কিম তাঁর কল্পনায় ইতিহাসের পাষাণপুরীতে অবরুদ্ধ জেব-উন্নিসার হৃদয়ের দুঃখজ্বালাপূর্ণ প্রণয়াবেগকে যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন তাতে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আধা-ঐতিহাসিক, আধা-কাল্পনিক। রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক আবর্তে নিমজ্জিত মবারকও ইতিহাসপ্রবাহে নির্বিবাদে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের ঘনঘটার ফাঁকে ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। মবারক-জেবউন্নিসার বিষাদ-গম্ভীর কাল্পনিক প্রেমকাহিনি মূল ঐতিহাসিক বিষয়ের সঙ্গে এমনভাবে বুনে দিয়েছেন বঙ্কিম যে ইতিহাসের ঝড়-ঝঞ্ঝায় উদ্বেল আকাশে মবারক-জেবউন্নিসার হৃদয়াবেগের বর্ণালীমায়াকে কখনো অবান্তর বা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না।

Scanned with CamScanner

এই ধারা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ রোমান্টিক যুগপর্বের অতিলৌকিক কল্পনা ও রহস্যময়তার সঙ্গে সম্পর্কিত। কোলরিজের কবিতায় এর এক স্বতন্ত্র রূপ আমরা দেখি। পাই মেরি শেলির *Frankenstein*-এর মতো কল্পবিজ্ঞানধর্মী রচনা ; এছাড়া এডগার অ্যালান পো'র গল্পে, শার্লট ও এমিলি ব্রন্টির উপন্যাসেও গথিক উপন্যাসের নানা লক্ষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাংলার গথিক উপন্যাসের নিদর্শন হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর *লালকেল্লা* ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের *কাল তুমি আলেয়া*-র নাম করা যায়।

ছ'শ পাতার বৃহদায়তন *কাল তুমি আলেয়া* উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে এক প্রচ্ছন্ন যৌনকামনার ব্যাপ্তি, অবক্ষয়িত ও বিকারগ্রস্ত জীবনচিত্র, রহস্যের আলো-আঁধারি। নারী-পুরুষের জীবনক্রিয়ায় নেপথ্য কামনার ছায়া, পারস্পরিক সম্পর্কের অস্পষ্টতা, সুলতান কুঠিতে কিংবা মিত্র পরিবারে অথবা কারখানা বা চারুদেবীর অট্টালিকায় হিংসা-দ্বেষ-যৌনতা-উৎকেন্দ্রিকতার দুর্বোধ্য জটিলতা— সব মিলিয়ে এ-উপন্যাস গথিক ধারার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রহস্য, অনিশ্চয়তা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অবক্ষয়-বিকার-আদিম প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয় চমকপ্রদ শিল্পকৌশলে উপন্যাসায়িত করেছেন লেখক।

(৯) চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস (Stream-of-Consciousness Novel) : 'চেতনাপ্রবাহ' বা 'Stream of consciousness' শব্দবন্ধটি মনস্তত্ত্ব থেকে আহৃত। প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁর *Principles of Psychology*-তে অর্ধচেতন স্তরের নানা ভাবনা-স্মৃতি-অনুভব সহ মানবমনের নিরন্তর প্রবাহকে নদীর প্রবহমান জলধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন : 'Consciousness flows—let us call it stream of thought, of consciousness, or of subjective life.' ১৮৯০-এ প্রকাশিত এই ভাবনারই সমান্তরালে দেখা গেল আর এক দর্শন—দার্শনিক বের্গসঁর *elan vital*। উভয় দার্শনিকই মানবমনের অন্তর্নিহিত চেতনার রহস্যটিকে ধরতে চেয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার ঠিক পরবর্তী সময়পর্বে একদিকে মনস্তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে আলোড়নসৃষ্টিকারী ভাব-ভাবনা ও অন্যদিকে 'আধুনিক' (Modernist) শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনসমূহের জন্মদান বাতাবরণে এক নতুন ধরনের উপন্যাসের উদ্ভব হয়, যা চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। এই ধরনের 'চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি' একটি বিশেষ রচনাকৌশল হিসেবে উপন্যাসে আরোপিত। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখিকা মে সিনক্লেয়ার, ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাস *Pointed Roofs*-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথম এই 'চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি'র উল্লেখ করেছিলেন। ডিকেন্স ও হার্ডি থেকে উদ্‌বর্তিত প্রচলিত কাহিনি-নির্ভর বাস্তবতাধী উপন্যাসের ধারা থেকে সরে আসার এক পরীক্ষাধর্মী প্রবণতা সূচিত হয়েছিল চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১০-এর ডিসেম্বর মাসে লন্ডন শহরে ভ্যান গগ, গগ্যাঁ, মাতিস, পিকাসো, সেজান প্রমুখের একটি চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যেখান থেকে 'Post Impressionism'-এর সূত্রপাত। এই চিত্রপ্রদর্শনীকে লক্ষ্য করেই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ মন্তব্য করেছিলেন : 'In or about December 1910 human character changed', মানবচরিত্র, যা অতীব জটিল ও দুর্জ্ঞেয়, তা কি কোনো বিশেষ মাস বা বছরে পালটে যেতে পারে? আসলে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলতে চেয়েছিলেন যে ঐ সময় থেকে মানবচরিত্র তথা মনকে দেখা, বোঝা এবং তাকে শিল্প-সাহিত্যে ব্যক্ত করার পদ্ধতি বদলে যেতে থাকে। একটি জমজমাট কাহিনির চৌম্বকশক্তিতে পাঠককে তৃপ্ত করা কিংবা চরিত্রের

বহিরঙ্গের খুঁটিনাটি, আচার-আচরণ, তার সামাজিক জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতার দিকটিকে বড়ো করে না দেখে, তার অন্তর-ধর্মের রহস্য ও তার বিভিন্নমুখী জটিল মানসপ্রক্রিয়ার উন্মোচন এবং কাহিনির চিরাচরিত দাসত্ব থেকে উপন্যাসকে মুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়। তথাকথিত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক যথা, বেনেট, ওয়েলস, গলস্‌ওয়ার্দি প্রমুখের রচনার বিষয় ও রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় এই নতুন মনস্তাত্ত্বিক, ব্যঞ্জনাধর্মী, গভীরসঞ্চারী রচনাশৈলী ও অপূর্ব কাব্যকল্পনামণ্ডিত ভাষারীতি 'চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি' নামে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে। মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ উপন্যাসে এর আগে ছিল না তা নয়, তবে আধুনিক মনোবিশ্লেষণ ও সমীক্ষণ বিষয়ক নানা তত্ত্ব, বিশেষত ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষণ, এই সময়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিল।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষায় মার্সেল প্রুস্ত-এর *A la recherche du temps perdu* উপন্যাসের প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'অন্তর্ভাষণ' বা 'interior monologue' না থাকলেও চেতনার স্মৃতিস্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল প্রুস্তের উপন্যাসে। ১৯১৫-তে ডরোথি রিচার্ডসনের সুবৃহৎ উপন্যাস *Pilgrimage*-এর প্রথম খণ্ড *Pointed Roofs* প্রকাশিত হলে ইংরেজি ভাষার উপন্যাস সাহিত্যে এই নতুন ধারার সূচনা হয়। পরের বছরই জেমস্ জয়েস লেখেন *A Portrait of the Artist as a Young Man*। তাঁর *Ulysses* (1922), ভার্জিনিয়া উল্‌ফের *Mrs. Dalloway* (1925) এবং উইলিয়াম ফকনারের *The Sound and the Fury* (1928) এই নতুন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসরীতির প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ। মানবচৈতন্য একটি ভাসমান হিমশৈলের মতো। বাইরে থেকে তার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে দেখতে পাওয়া যায় এবং বেশিরভাগ অংশ থাকে দৃষ্টির অন্তরালে নিমজ্জিত। মানবমনের সেই নিমজ্জিত অংশটির সন্ধানে, এক নতুন ভাষা-ভঙ্গী-রীতি-পদ্ধতি অবলম্বনে, চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস আভাসিত করতে চায় চরিত্রের গূঢ় অন্তর্লোক যা বস্তুতান্ত্রিক তথা বাস্তববাদী পন্থা-পদ্ধতির নাগালের বাইরে। রবার্ট হামফ্রি প্রদত্ত চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের সংজ্ঞা বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : "We may define stream of consciousness fiction as a type of fiction in which the basic emphasis is placed on explanation of the pre-speech levels of consciousness for the purpose, primarily, of revealing the psychic being of the characters." চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে হামফ্রি চরিত্রের মানস-সত্তার উন্মোচনের জন্য চেতনার প্রাক-বাচনিক স্তরসমূহ অবলম্বন করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাসে চিন্তাভাবনাগুলি প্রাক্- বাচনিক স্তরের— যুক্তি পারম্পর্য, বাক্যগত অন্বয়, শব্দের ব্যাকরণসম্মত ও প্রথাগত বিন্যাস ইত্যাদি গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত। জেমস্ জয়েস তাঁর *Ulysses* উপন্যাসে অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে মানবচৈতন্যের গভীর অন্তর্ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, যার জন্যে ভার্জিনিয়া উলফ জয়েসের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন—"In contrast with those whom we have called materialists, Mr. Joyce is spiritual ; He is concerned at all costs to reveal the flickerings of that innermost flame which flashes its messages through the brain." ডাবলিন শহরের জনৈক লিওপোল্ড ব্লুমের মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মানস-বৃত্তান্তের এক আশ্চর্য, জটিল, অন্তর্লীন জগৎ জয়েস উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন তাঁর *Ulysses*-এ।

চৈতন্যপ্রবাহরীতির পূর্বাভাস ছিলো অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ উপন্যাসকার লরেন্স স্টার্নের *Tristram Shandy* (1760-67)-তে। উপন্যাসের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে, আঙ্গিক ও

Scanned with CamScanner

ভাষার স্বীকৃত রাজপথ পরিত্যাগ করে স্টার্ন মানবমনের গূঢ় জটিলতাগুলিকে ধরতে চেয়েছিলেন এক আপাত-অসংলগ্ন, দুরধিগম্য কৌশলে। *Tristram Shandy*-র কোথাও কোথাও তাই সাদা কিংবা কালো কিংবা তারকাচিহ্নিত পাতা—মানবমনের অপার রহস্যভেদের বিচিত্র ফলশ্রুতি।

ইংরেজি উপন্যাসের ক্ষেত্রে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম সচেতন শিল্পী হেনরি জেমস। জয়েস-রিচার্ডসন-উল্ফের অনেক আগেই হেনরি জেমস ভিক্টোরীয় লেখকদের জমজমাট গল্প বলার অনুবর্তন না করে, চরিত্রের বাহ্যিক আচার-আচরণের বাস্তবসম্মত রূপায়ণ না করে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকে বাইরের জগৎ থেকে ঘুরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন মানবচরিত্রের অন্তর্লোকে। বাইরে থেকে দেখা খণ্ডিত মানুষটাকে নয়, জেমস দেখতে চেয়েছিলেন ভেতরের সম্পূর্ণ মানুষটাকে। মানবচেতনার পরতে পরতে যে নিরবচ্ছিন্ন আলো-অন্ধকারের খেলা চলছে, যে সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতির চাঞ্চল্যে মানবমন সর্বদাই মুখর ও আলোড়িত, নবতর শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার কথা জেমস্ বলেছিলেন তাঁর *The Art of Fiction*-এ। বাস্তববাদী তথা প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিকদের আক্রমণ করে চেতনাপ্রবাহরীতির উপযুক্ততা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্ফ তাঁর 'Modern Fiction' শীর্ষক প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন তা জেমসের ভাবনারই পূর্ণতর রূপ :

> 'Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a myriad impressions—trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms ; and as they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the accent falls differently from of old.... Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged ; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end.'

বের্গসঁও সময়কে দেখেছিলেন এক ধারাবাহিক প্রবাহরূপে।

চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের উদ্ভব ও বিস্তার, তার সংজ্ঞা ও স্বরূপের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এখন এই ধরনের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে পারি :

১. বহির্জগৎ নয়, অন্তর্জগতের জটিল টানা-পোড়েন-ই এ জাতীয় উপন্যাসের মনোনিবেশ ও প্রকাশের বিষয়—'a novel that pays great attention to the complicated mental states of its character.'

২. এ জাতীয় উপন্যাসে কোনো আকর্ষণীয় গল্প/কাহিনি, একটি সুসংবদ্ধ প্লট থাকে না। কি ঘটছে তা দেখানো নয়, কেন এবং কি জন্যে ঘটছে, বা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র সময়ানুক্রমিকভাবে একটি সুষম কাহিনিবিন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্লীন আবেগ-অনুভূতি এখানে ব্যক্ত করা হয় না।

৩. মানবমনের বহুবিচিত্র ও অসংখ্য চিন্তা ও অনুভবকে, চরিত্রের যে অন্তর্লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাকে গোচরীভূত করতে লেখক গ্রহণ করেন 'অন্তরস্থ স্বগতোক্তি' বা 'interior monologue'-এর কৌশল। এই পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনাগুলি এলোমেলোভাবে আসে। যুক্তি-পরম্পরা, শাস্ত্রবতার ভেদাভেদ, শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য গঠনের ব্যাকরণরীতি, এসব ভেঙেচুরে ঔপন্যাসিক মানসপ্রবাহের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার ছবিটি ভ্যানগগের চিত্রকলার মতোই পরিস্ফুট করেন।

মূলত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তর্ভাষণ (direct/indirect interior monologue), সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শীর বিবরণ (omniscient description) এবং স্বগতোক্তি (soliloquy)-র মাধ্যমে ঔপন্যাসিক চেতনার প্রবাহটিকে দেখাবার চেষ্টা করেন। 'অন্তর্ভাষণ' চরিত্রের মানসিক বিষয় (psychic content) ও তাকে ব্যক্ত করার প্রক্রিয়াগুলিকে (processes) দেখাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 'প্রত্যক্ষ অন্তর্ভাষণ' চরিত্রের চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে সরাসরি পাঠকের কাছে তুলে ধরে উত্তম পুরুষে। লেখকের উপস্থিতি বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন থাকে না। 'পরোক্ষ অন্তর্ভাষণে' লেখক উপস্থিত হন চরিত্রের মন (Psyche) এবং পাঠকের মাঝখানে। ব্যবহৃত হয় প্রথম বা মধ্যম পুরুষ রীতি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তর্ভাষণ ছাড়া প্রয়োগ করা হয় সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শী লেখকের বর্ণনা বা চরিত্রের অন্তর্জীবনের উন্মোচনে ব্যবহৃত হয়। সর্বদর্শী লেখক প্রচলিত বর্ণনা-পদ্ধতিতে চরিত্রের চেতনাকে এমনভাবে প্রকাশ করেন যে পাঠকের মনে হয় তিনি চরিত্রের মনের ভেতরে সর্বদাই ঢুকে বসে আছেন। ডরোথি রিচার্ডসনের *Pilgrimage* এই 'Omniscient' রীতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। চরিত্রের মন বা চেতনাকে উপস্থাপিত করতে আর ব্যবহৃত হয় 'স্বগতোক্তি' (Soliloquy) যা 'অন্তর্ভাষণে'র থেকে আলাদা। 'অন্তর্ভাষণ' অংশত বা পুরোপুরি অনুচ্চারিত এক অবস্থার প্রকাশ যার উদ্দেশ্য 'psychic identity'-কে তুলে ধরা ; অন্যদিকে 'স্বগতোক্তি' একক চরিত্রের স্ফুটবচন, চিন্তা ও ভাবের সংশক্তি যেখানে অনেক গভীর।

৫. হেনরি জেমস্ ও বের্গসঁ-র দর্শনভাবনা থেকে চেতনাপ্রবাহের শিল্পরীতি উদ্ভূত। এই ভাবনা অনুযায়ী চেতনা তরল প্রবাহের মতো গতিশীল ও স্বেচ্ছাচারী ; সময়ের প্রচলিত পর্যায়ে তাকে আটকে রাখা যায় না। চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে তাই 'সময়ানুক্রমিক বিন্যাস' তথা 'Chronological Order' থাকে না। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চেতনা যেমন ছুটে চলে, তেমনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব এলোমেলোভাবে মিলেমিশে যায় চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে।

৬. জয়েসের *Finnegan's Wake*-এর প্রায় অগম্য জটিল চেতনাপ্রবাহ রীতি এবং রিচার্ডসনের *Pilgrimage*-এর সহজতর কৌশল ছাড়াও আর এক ধরনের পদ্ধতি লক্ষ করা যায় যাকে বলা হয় 'Cinematic' গদ্যরীতি। চলচ্চিত্রে যেমন বিভিন্ন সময়ে তোলা শটগুলিকে আগে পরে প্রয়োজনে কাটা-ছেঁড়া করে জুড়ে তোলা হয়, তেমনিভাবে 'Montage'-এর রীতিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ দেখাতে পারেন ; অতিক্রম করতে পারেন স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার অন্তরায় ; কখনো এগিয়ে, কখনো পেছিয়ে চেতনাপ্রবাহকে দিতে পারেন অনায়াস গতি।

৭. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে আমরা পাই এক অসম্ভব কল্পনামণ্ডিত, ছন্দোময় গদ্য। থাকে এক স্বয়ংক্রিয়তা ও আপাত-অসংলগ্নতা ; অনেক সময়ই ছেদ বা যতি চিহ্ন বর্জন করে লেখক অনর্গল চেতনাপ্রবাহকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরবার চেষ্টা করে থাকেন।

বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস রচনার শুরু বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে। বাইরের দৃশ্যমান জগৎ থেকে নায়ক-নায়িকার অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বঙ্কিম, যদিও শৈলীর নিরিখে এগুলিকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস বলা যাবে না। সেদিক থেকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি, চতুরঙ্গ, এবং ঘরে-বাইরে-তে। ভাষা ও চরিত্র রূপায়ণের অভিনবত্বে চতুরঙ্গ এবং বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের ত্রিকোণ সম্পর্কের অন্তরঙ্গতায় ঘরে-বাইরে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের

Scanned with CamScanner

স্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ। রবীন্দ্রোত্তর কালের লেখকদের মধ্যে চেতনাপ্রবাহ কলাবিধি অনুসরণে লেখা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস, *অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহনা*, বুদ্ধদেব বসুর *লালমেঘ*, গোপাল হালদারের *একদা* এবং আরো সাম্প্রতিক কালে মতি নন্দীর *নক্ষত্রের রাত* ইত্যাদি উল্লেখনীয়।

বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের উদাহরণ হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* (১৯৪৫) একটি সার্থক ও স্বীকৃত গ্রন্থ। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি পরিবারভুক্ত চারটি চরিত্রের চেতনার স্তরে চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার যে প্রবাহ ধাবিত হচ্ছিলো, তাকে, অর্থাৎ বিলু, বাবা, মা ও নীলু, এই চারটি চরিত্রের অন্তর-সত্য উদ্ভাসিত করেছিলেন সতীনাথ কারান্তরালের জীবন নিয়ে লেখা *জাগরী* উপন্যাসে। চেতনার প্রাক-বাচনিক স্তরে যে অভিজ্ঞতা অনুভূতি, স্মৃতির অনুষঙ্গে যে চিন্তার প্রবাহ বিলুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে তার নিজের মনে এবং তার বাবা, মা ও ছোটভাই নীলুর মনের গভীরে ভাসছিল তাকে নিপুণ শিল্পদক্ষতায় সাজিয়ে লেখক নির্মাণ করেছেন একটি কাহিনিবৃত্ত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে উপন্যাসটির গঠনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে : "...কারাগারে বন্দী একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধার মৃত্যুমুহূর্ত প্রতীক্ষায় দুর্বিষহ, স্মৃতিভারাকুল ও কল্পনাজালবয়নে রুদ্ধশ্বাস, অন্তিম জীবনের দুস্বপ্ন-বিভীষিকার এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও আবেগতপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনা তাহার সমস্ত অনুভূতিকে এমন একাগ্র ও একলক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে যে, ইহারই টানে তাহার পূর্বজীবনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্মৃতিসূত্রগুলি অনিবার্যভাবে এই সর্বগ্রাসী ভাবকেন্দ্রে সংহত হইয়াছে।"

নির্জন 'ফাঁসি সেলে' মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিলু, 'আপার ডিভিসনে' তার গান্ধীবাদী বাবা, 'আওরাৎকিতা'য় তার মা, এবং 'জেল গেটে' ছোটো ভাই নীলু—চারটি চরিত্রই একটি ভয়ঙ্কর পরিণতিকে সামনে রেখে চিন্তার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চেতনার গভীর থেকে গভীরতর প্রবাহে ক্রমশ ডুবে গেছে। স্মৃতির আঁকাবাঁকা পথ ধরে নানা ঘটনা, কথা, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নানা অনুভূতি এলোমেলোভাবে ভীড় করেছে যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই অনুভব করতে চেয়েছে আপন অন্তর-সত্যকে যা কেবল অনুভবের যোগ্য কিন্তু যাকে বাচনিক রূপে প্রকাশ করা দুষ্কর। উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে কিভাবে লেখক বিলুর অন্তর্জগতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন :

> ওগুলি বোধ হয় কাক— এতদূর হইতে ঠিক চেনা যায় না...পাখিরা কিন্তু রাত্রে ডানা ঝট্‌পট করে—
>
> সেই একবার বকড়ীকোলে মিটিং করিয়া ফিরিবার সময় কামাখ্যাথানের বিরাট বটগাছটির নীচে আমাদের সারারাত থাকিতে হইয়াছিল। এখানকার মাটিতে শুইয়া থাকিলে নাকি কুষ্ঠ রোগ সারিয়া যায় ... অনেকগুলি কুষ্ঠরোগী আশপাশের গাছগুলির নীচে শুইয়া রহিয়াছে। ছিলাম আমি আর নীলু ; আর সঙ্গে ছিল বোধ হয় সহদেও। সারা রাত পাখির ডানা নাড়ার সে কী শব্দ। ...মনে হইতেছে মা দাওয়ায় বসিয়া আছেন। মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীলুর দিকে তাকাইয়া, দন্তমূলে জিহ্বা ঠেকাইয়া একটু শব্দ করিলেন—'চিক্'। তারপর ছড়া কাটিলেন 'স্বভাব না যায় ম'লে'। নীলু আমার দিকে চোখ দিয়া ইশারা করিল—ভাবটা এই যে 'দাদা, এইবার'। দুজনে যাহা ভাবিয়াছিলাম—ঠিক যাহা ভাবিয়াছিলাম—মা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—

এইভাবেই বিলুর চেতনায় একটা একটা অভিজ্ঞতা, ঘটনার স্মৃতি ভাসতে ভাসতে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। তৈরি হয় চলচ্চিত্রের 'মন্তাজ' (Montage)।

Scanned with CamScanner

(১২) মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস (Psychological Novel) : যে উপন্যাসে লেখক 'প্লট' বা আখ্যানভাগের চাইতে অনেক বেশি নজর দেন চরিত্রের মন, মনন, মেজাজ ও মানসিকতাকে প্রতীক-সংকেত-অনুষঙ্গের এক ইঙ্গিতময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে, যে উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্মানস, মনের বিচিত্র গতিবিধি, কাহিনির প্রথাগত কাঠামোকে লঙ্ঘন করে এক অন্তর্ময় পরিবেশ রচনা করে, সেই উপন্যাসকে আমরা সাধারণভাবে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলে থাকি।

মানুষের মন, তার আনন্দ-বেদনা, উৎসাহ-সংশয়, প্রত্যয়-হতাশাকে একটি কাহিনির বিন্যাসের মাধ্যমে দেখাতে চান ঔপন্যাসিক ; তাই বোধ হয় এমন উপন্যাস পাওয়া যাবে না যাতে মানবমনের কোন কথাই নেই। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, 'ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন'। 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ', যা দিয়ে নির্মিত হয় 'প্লট', যতই জমকালো হোক না কেন, মনের জটিল অন্তঃপুরে কমবেশি আলোকপাত ঘটবেই। বঙ্কিমের নিজের উপন্যাসগুলিতেও ঘটনার তীব্র পারম্পর্য যতই থাক না, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রবণতাগুলিকে আভাসে-ইঙ্গিতে উন্মোচন

Scanned with CamScanner

করেছেন তিনি। *কপালকুণ্ডলা*-র মতো রোমান্সধর্মী রচনাতেও তাই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের কুশলতা নজরে পড়ে। ধরা যাক কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রথম প্রণয়প্রকাশের বর্ণনার মিতব্যয়ী অথচ গভীর বিশ্লেষণ, কিংবা যেখানে নবকুমার ও মতিবিবির দেখা হচ্ছে ও সম্ভাষণ হচ্ছে, অথবা চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি' ও তার অঙ্গুলি সংকেত অনুসরণ করে যখন চলছিলেন। বঙ্কিমের সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলিতেও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা পরিণত। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোবিন্দলাল-রোহিণী-ভ্রমরকে নিয়ে প্রেম ও রূপতৃষ্ণার যে জটিল ত্রিকোণ তৈরি করেছিলেন লেখক, বিশ্লেষণ-গভীরতা ও রহস্যময় সূক্ষ্মদর্শিতায়, তার অসম্ভব উন্মোচন *কৃষ্ণকান্তের উইল*-কে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণের শিরোপা দেবে।

রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। সামাজিক নীতিবোধের বৈধতা লঙ্ঘন করে গড়ে-ওঠা মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সর্বগ্রাসী আকর্ষণ-বিকর্ষণ লীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং নীতিমূলক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-ই *চোখের বালি*-র কেন্দ্রীয় উপজীব্য। আধুনিক উপন্যাসে অন্তর্ময়তা ও বিশ্লেষণী বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা সংযোজিত *চোখের বালি*-তে। বহির্বাস্তব নয়, মহেন্দ্র-আশা-বিহারী-বিনোদিনী নামের চার যুবক-যুবতীর মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই এ-উপন্যাসে সমসময়ের চেহারাটি ধরা হয়েছে। সামাজিক মানুষের ভেতর-বাইরের এমন বিশ্লেষণী চিত্র এর আগে বাংলা উপন্যাসে বড় একটা দেখা যায় নি। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের ত্রিকোণ সম্পর্ক উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আর এক উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত। নিখিলেশের স্থির নিরপেক্ষতা ও নীতিজ্ঞানের চাইতে সন্দীপের প্রবল আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণ কিভাবে বিমলাকে তার অজ্ঞাতেই সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট করে তোলে, তার দোলাচল ও অনিশ্চয়তার এক বিশ্লেষণী চিত্র রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট করেছেন শাণিত সংকেতময়তায়। রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলন এ-উপন্যাসে সন্নিবেশিত হলেও এবং পটভূমি হিসেবে সে-সবের যত গুরুত্বই থাক, উপন্যাসের উপজীব্য কিন্তু মানুষের মন ও সম্পর্কের জটিলতা। তিনটি মুখ্য চরিত্রের প্রেমঘটিত মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদের আত্মকথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত।

উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়ায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস এক চমকপ্রদ মোড় নেয় ; এক নতুন নির্মাণরীতি ও ভাষাশৈলী গ্রহণ করে এবং উদ্ভব হয় আধুনিক 'চেতনাপ্রবাহ' পদ্ধতির, যে-বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আসলে মনস্তত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু যুগান্তকারী ভাবনা ও আবিষ্কার শিল্প-সাহিত্যে ব্যাপক রদবদল ঘটিয়েছিল। প্রচলিত কাহিনি-নির্ভর উপন্যাসে—স্যামুয়েল রিচার্ডসন থেকে মেরেডিথ ও হার্ডি পর্যন্ত—চরিত্রের মনের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে আলো ফেলা হলেও, মানবচেতনার নিমজ্জিত ও অর্ধনিমজ্জিত স্তরগুলিকে অন্তরীণ সংলাপ তথা চলচ্চিত্রের মন্তাজের রীতিতে উদঘাটিত করেছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, ডরোথি রিচার্ডসন, মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস প্রমুখেরা তাঁদের নতুন মনোবিশ্লেষণী কৌশলে। 'মনের সংসারের কারখানাঘরে' এভাবে ঢুকে পড়ে নিবিড় খানাতল্লাস করার পেছনে ছিলো ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, মার্কসীয় সমাজচিন্তা, আইনস্টাইন ও প্লাঙ্কের পদার্থবিদ্যাবিষয়ক আবিষ্কার—বিশেষত অণু সংক্রান্ত ধারণা—ইত্যাদির এক সামগ্রিক অভিঘাত। মানবমনকে এসবের ফলে আর আগের মতো সরলরৈখিক, পরম্পরাযুক্ত, কালানুক্রমিক বিন্যাসে দেখা সম্ভবপর ছিল না।

Scanned with CamScanner

স্যামুয়েল রিচার্ডসন পামেলা, ক্লারিসা, স্যার চার্লস গ্র্যান্ডিসন প্রভৃতি পত্রোপন্যাসে নর-নারীর আবেগ ও মননকে ব্যক্ত করেছিলেন পত্রাকারে, প্রত্যক্ষ আত্ম-উন্মোচনের মাধ্যমে। লরেন্স স্টার্ন তাঁর ট্রিস্ট্রাম্ শ্যান্ডি উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক জটিলতাসমূহকে তুলে ধরতে প্রথাগত আঙ্গিক থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছিলেন ; চেতনাপ্রবাহরীতির তিনিই প্রথম উদ্‌গাতা। উনিশ শতকে রোমান্টিক ভিক্টোরীয় যুগপর্বে জেন অস্টেন, এমিলি ব্রন্টি, জর্জ ইলিয়ট ও এলিজাবেথ গ্যাসকেল—এই চার মহিলা ঔপন্যাসিক মানবচরিত্র, বিশেষত নারী চরিত্রের অন্তর্জগতে আলোকপাত করেছিলেন। প্রসঙ্গত, *Ruth, Adam Bede, Romola* প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এমিলি ব্রন্টির *Wuthering Heights* এবং তার দুই প্রধান চরিত্র—হিথক্লিফ্ ও ক্যাথেরিন—মানবমনের দুর্নিবার আবেগ-আকাঙ্ক্ষার এক আশ্চর্য রহস্যমণ্ডিত উদাহরণ। চেতনাপ্রবাহ-পূর্ববর্তী মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে অপর একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম জর্জ মেরেডিথ। অনুপুঙ্খের বৈশদ্যে ও বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে মানবমনকে মেরেডিথ পরিস্ফুট করেছিলেন *The Egoist*-এ।

উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন মাত্রা পেয়েছিলো চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে। মনের ভেতর যে গোপন ও স্বাধীন স্রোতধারা বহমান তার অবিচ্ছিন্ন গতিকে এক আগাগোড়া অন্তর্ময় আঙ্গিকে, অন্তরীণ সংলাপের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছিলেন চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির উপন্যাসকারেরা। জয়েসের ইউলিসিস সেই কল্পনাকুশল, চিত্রকল্পনির্ভর, অন্তরীণ মানসভ্রমণবৃত্তান্ত। জনৈক লিওপোল্ড ব্লুমের মনের ভেতরকার ছায়াদীপ্তি ও অন্ধকার এক চিত্রল, প্রতীকী ভাষারীতিতে জয়েসের পাঠককে করেছিলো আবিষ্ট।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতার নিদর্শন স্বীকৃত। প্রসঙ্গত, শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসটিরও নাম করা যায়। মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোলাচল চিত্তবৃত্তি, মহিমের নিরাবেগ ও শান্ত কাঠিন্য এবং সুরেশের উন্মত্ত ব্যাকুলতা, এই দুই প্রতিস্পর্ধী শক্তির মাঝে অচলার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অনিশ্চয়তা—মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলে আলোচ্য উপন্যাসের সারবস্তু। এই উপন্যাসেই শরৎচন্দ্র সর্বাধিক তাঁর চরিত্রদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন। চরিত্রেরাও নিজেদের ব্যক্ত করেছে স্বগতোক্তি ও একান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল, চোখের বালি কিংবা গৃহদাহ-কে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক তথা চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের গোত্রভুক্ত করা যাবে না। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের এই অভিনব অন্তর্ময় রীতিতে প্রথম বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর লাল মেঘ, কালো হাওয়া, তিথিডোর প্রভৃতি গ্রন্থে। এই ধারার আর এক মগ্ন অনুশীলনকারী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ত্রয়ী-উপন্যাস অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা-য় মার্সেল প্রুস্তের মতো 'সময়' নামক আয়তনের নিপুণ ব্যবহারে, খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও সংকেতসূত্রের সাহায্যে এক অন্তর্মর্মী বিশ্লেষণ উদ্ভাসিত করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। উপন্যাসত্রয়ীর নামকরণেই চেতনাপ্রবাহরীতির ছাপ রয়েছে।

(১৩) রাজনৈতিক উপন্যাস (Political Novel) : যে-কোন শিল্প বা সাহিত্যকর্ম এক অর্থে রাজনৈতিক, কারণ যে-কোন যুগ বা সময়ের মানুষ, তাদের সামাজিক জীবন নিয়ে লিখতে গেলে, বিশেষত উপন্যাসে, বৃহত্তর অর্থে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা অসম্ভব। পরিশুদ্ধ, অরাজনৈতিক রচনা বলে কিছু আদৌ হয় কিনা সন্দেহ। তবে রাজনৈতিক উপন্যাস বলতে আমরা সেই ধরনের উপন্যাসকে বুঝবো যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা ও কাহিনিকে অবলম্বন করে একটি দেশ ও জাতির, স্থান ও কালের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, তার দ্বন্দ্ব-সমস্যা-সংকট ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিছক কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়,

একটি দেশ ও জাতির প্রাণময় উত্তেজনা, একটি সর্বকালীন আবেদনে বিধৃত হয় সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাসে। অবশ্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞান/মতাদর্শ উপন্যাসের লৌকিক রূপকে ছাপিয়ে প্রচারধর্মী ও উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে। আসলে রাজনীতি ও উপন্যাস, এ দুয়ের যথার্থ সমন্বয় কিভাবে ঘটবে সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সহজ নয়।

অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় ও উপকরণসমূহে রাজনীতির অল্পবিস্তর ছাপ থাকে; থাকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, একটি দেশ ও জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকট ও সর্পিলতার প্রতিচ্ছবি ; কিন্তু এসব কারণেই সেসব উপন্যাসকে 'রাজনৈতিক' শ্রেণিভুক্ত করা যায় না। আবার অনেক সামাজিক উপন্যাসে থাকে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমি, সমাজজীবনের নিয়ম-নীতি-অনুশাসনের নিষ্ঠুর অমানবিকতার চিত্র ; তবুও তাকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা স্কটের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অথবা শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ কিংবা ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট-কে কি কেউ রাজনৈতিক রচনা বলবে? রাজনৈতিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক বিষয়-প্রসঙ্গ অথবা সামাজিক নিয়ম-অনুশাসনের কথা থাকতে পারে, তবে ঐতিহাসিক বিষয়ের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও আন্দোলন অথবা সামাজিক প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি সেই উপন্যাসের মুখ্য ব্যাপার।

রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে আমরা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত পর্যালোচনা অংশটি পড়িয়ে দেখতে পারি :

> "সমসাময়িক জগতের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকৃতি ও সুকুমার আদর্শবাদ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর, ১৯৪২-এর আগস্ট-আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা, কংগ্রেস ও কমিউনিজম্ মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, স্বাধীনতা-লাভের পর বৈষম্যবর্জিত নতুন সমাজ গড়ার একাগ্র প্রচেষ্টা, দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা নিয়ে আধুনিকযুগের বহু উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এই দেশব্যাপী উত্তেজনার মোহ যেন সাহিত্যিককে পেয়ে বসেছে ও তার শাশ্বত মূল্যবোধকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছে। এবিষয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটি অনায়াস-লভ্য যোগসূত্র বর্তমান, এমন একটি সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশোন্মুখ, লিখতে বসলেই এমন একটি নিবিড় আবেশ ঘনিয়ে আসে যে এই প্রলোভন সংবরণ অমানুষিক আত্মসংযমের ব্যাপার। দেখতে দেখতে নদীতে জোয়ার আসার ন্যায়, ভাবের ও ভাষার দুর্দম উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের কলেবর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ... রাজনৈতিক উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করে মনে এমন আরাম ও তৃপ্তি আনে যে, এতে গা ভাসালেই স্রোতোবেগে চরম সিদ্ধির উপকূলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।"

এই পর্যালোচনা থেকে রাজনৈতিক উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি সংকেতসূত্র নিরূপণ করা সম্ভব :

১. মূলত সমকালীন ঘটনাসমূহের আলোড়নে এ উপন্যাসের জন্ম ;
২. সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের সংকট, উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা এর ভিত্তিভূমি ;
৩. পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ এবং নতুন রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নবিহ্বলতা ও আদর্শবাদ এ জাতীয় উপন্যাসের প্রাণ ;
৪. সমসাময়িক উত্তেজনার তাড়নায় চিরন্তন মূল্যবোধ যেন লেখকের ভাবনায় কিছুটা আচ্ছন্ন ;

৫. এক সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবালুতা পাঠক ও লেখককে গ্রথিত করে রাখে ;
৬. ভাবের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভাষার দুর্বার জোয়ারে লেখক মোহাবিষ্ট করে ফেলেন পাঠককে ;
৭. জনপ্রিয়তার নিশ্চিত আশ্বাসে আশ্বস্ত থাকেন লেখক।

যে যুগে সামাজিক জীবনের সংকট ও বিপর্যয় যত তীব্রতা পায়, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জটিলতা ও টানাপোড়েন যত বাড়তে থাকে, সে যুগে ততই রাজনৈতিক উপন্যাস (এবং নাটক ও কাব্যও) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। J. L. Blotner-এর কথায়—"As an art form and an analytical instrument, the political novel, now as ever before, offers the reader a means for understanding important aspects of the complex society in which he lives, as well as a record of how it evolved." অর্থাৎ রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের মধ্যে থেকেই, সংঘাত ও প্রতিবাদের পরিমণ্ডলেই রাজনৈতিক উপন্যাসের উদ্ভব। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর চিত্রণের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে এ-জাতীয় উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। Blotner উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন জোসেফ কনরাডের *Nostromo*, যেখানে এক খনি-মালিক তার ব্যবসায়িক স্বার্থে রাজনৈতিক আন্দোলনে আড়াল থেকে মদত দিচ্ছেন।

রাজনৈতিক উপন্যাস বিষয়ে কিছু সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত ঔপন্যাসিক সতর্ক হবেন উগ্র প্রচারসর্বস্বতা এড়িয়ে চলতে ; কোন বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতাদর্শের প্রতি অন্ধ অনুগত্য থাকলে তাঁর রচনা নিছক প্রচার-মাধ্যমে পরিণত হবে। G. D. H. Cole তার *Politics and Literature*-এ পরিষ্কার বলেছিলেন—"Mere Chronicle is not history, nor mere factual political writing political literature..." কাজেই নিছক প্রচার কিংবা নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া রাজনৈতিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সমস্যা ও সমাজ বাস্তবতাকে যেমন উপন্যাসকার অগ্রাহ্য করতে পারেন না, তেমনি উপন্যাসে শিল্পরূপ ও রীতি সম্পর্কেও তাঁকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। তৃতীয়ত, কেবলমাত্র তথ্য ও পরিসংখ্যান অর্থাৎ বস্তুগত সত্যের ওপর ভর করে ঔপন্যাসিক চলতে পারেন না, তাঁকে একটি সামগ্রিক সত্যের সন্ধান করতেই হয়।

সমালোচক শিশির দাস বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-কে 'ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস' বলেছেন। অন্যদিকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গণনাযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস রচয়িতা।' এ মতদ্বৈধ সরিয়ে রেখে বাংলা উপন্যাসের ক্রমপ্রবাহের দিকে তাকালে দেখা যাবে রাজনীতি তার অন্যতম প্রধান বিষয়। শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*, গোপাল হালদারের *একদা*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী*, *ঢোঁড়াই চরিত মানস*, সমরেশ বসুর *বি. টি. রোডের ধারে*, *উত্তরঙ্গ*, *শ্রীমতী কাফে*, মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশীর মা* ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট-মতাদর্শ-ঘটনাক্রম নিয়ে লেখা হয়েছে এবং স্বাধীনতা-পূর্ব অহিংস-সহিংস আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালে নকশালবাড়ির রক্তাক্ত অধ্যায় নিয়েও উপন্যাস রচনার কোনো বিরাম নেই।

রাজনৈতিক উপন্যাসের উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* ও মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশীর মা*-র সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে বর্তমান বিষয়ের আলোচনায় ছেদ টানবো। *ঘরে-বাইরে*-র মতো *চার অধ্যায়* রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত, যদিও অনেকেই একে রাজনৈতিক উপন্যাস বলতে রাজি নন। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক, সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম একদিকে, আর অন্যদিকে অতীন ও এলার প্রেম——এ দুয়ের

মধ্যে যেন এক ঘোর বিরোধ, বাইরের সর্বনাশা প্রলয় যেন ঘরের সবকিছু ছারখার করে দেবে। এ-উপন্যাসে বিপ্লববাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেশ ও চরিত্রাবলীর ওপর সেই প্রতিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত হলেও রাজনৈতিক বিষয় অপেক্ষা প্রেমজটিলতা ও তার ব্যর্থ পরিণতিজনিত বেদনাবোধই রবীন্দ্র-উপন্যাসের মূল সুর। বিপ্লবীদের নেতা ইন্দ্রনাথ, তৎসহ বটু, কানাই প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে, বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে অতীনের অভিযোগগুলির মধ্যে দিয়ে *চার অধ্যায়* উপন্যাসে বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের যে ছবিটি পাই তার ঐতিহাসিকতা ও সত্যানুবর্তিতা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের বাস্তবতা উপেক্ষা করে, বিপ্লববাদ ও বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের যে চিত্র এঁকেছেন, তা কেবলমাত্র কল্পিতই নয়, অনেকাংশে কালিমালিপ্ত। প্রেমের আকর্ষণ ও সার্থকতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসকে বাস্তবানুগামিতা ও বস্তুনিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

ইংরেজ আমলে বর্মা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* প্রকাশের পরেই নিষিদ্ধ হয়েছিলো। রহস্যময় ও প্রায়-অলৌকিক সব্যসাচী চরিত্রে শরৎচন্দ্র আরোপ করছিলেন সাহসী ও বুদ্ধিমান এক রাষ্ট্রদ্রোহীর আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের চমকপ্রদ অনুভূতি। সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের বাসনাকে সব্যসাচী পরিচালিত করেছিলেন গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যক্রমের রোমাঞ্চকর পথে। হয়তো এ-উপন্যাসের রাজনৈতিক ভাবনায় রোমান্টিকতার কিছু অতিরেক আছে এবং শৈল্পিক প্রকরণেও এ-গ্রন্থ ত্রুটিমুক্ত নয়, তথাপি স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে পথের দাবী বিশেষ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিলো।

মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশীর মা* ১৯৭০-এর দশকের অতি-বাম নকশালপন্থী আন্দোলনের সময়-প্রেক্ষিতে লেখা সাম্প্রতিক কালের বিশেষ আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস। তার মতো আরো অনেক আদর্শবাদী বিপ্লবী যুবকের সঙ্গে এই উপন্যাসের ব্রতী পরিচিত সুখী জীবন ছেড়ে ঝাঁপ দিয়েছিলো শোষণমুক্তির অগ্নিবলয়ে। নিহত হয়েছিলো রাষ্ট্রশক্তির দমনমূলক সন্ত্রাসে। পুলিশের খাতায় সে হয়ে গিয়েছিলো কেবলমাত্র একটি সংখ্যা—'হাজার চুরাশী'। ব্রতীর মা সুজাতা যখন ছেলেকে হারানোর বেদনায় খুঁজতে থাকেন ব্রতীদের স্বপ্নের জগতের ঠিকানা, তখন সুজাতার স্বামী ও পরিবারের অন্যরা ব্রতীকে অস্বীকার করে আশ্রয় নিতে চায় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। উপন্যাসের শেষে বাড়িতে মেয়ের পাকা দেখার দিনটিতে কুখ্যাত পুলিশ আফিসারের উপস্থিতিতে হাজার চুরাশীর মা ব্যক্ত করেন নিঃশব্দ ঘৃণার উচ্চারণ। রাজনৈতিক বিষয় ও প্রেক্ষিত এ-উপন্যাসে মানবিক আবেগে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে।

(১৪) রূপক উপন্যাস (Allegorical Novel) : বাস্তবজীবনের ভিত্তিভূমিতে উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক শিল্প-নির্ভর, নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাঁর উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মধ্যযুগীয় 'রোমান্স' থেকে উদ্বর্তিত ও রূপান্তরিত রূপক-আখ্যানিকার তাই কাহিনিবয়নের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হলেও সার্থক উপন্যাসের আবির্ভাব আরো পরে। মূল আখ্যানবস্তুর অন্তরালে কোনো প্রতীকতা সচেতনভাবে আরোপ করাই রূপকের উদ্দেশ্য। বহি-রঙ্গের রূপ ও অর্থের সমান্তরাল কোনো এক অন্তর্নিহিত অর্থকে ব্যঞ্জিত করে তোলাই রূপকের কাজ।

বাংলায় রূপক-উপন্যাসের উদাহরণ হিসেবে নাম করা যেতে পারে রমাপদ চৌধুরীর *হলয়*, যেখানে নামকরণ এক রূপক অর্থের আভাস দিচ্ছে। সত্তর দশকের এই উপন্যাসের নায়ক দেখে

Scanned with CamScanner

তার ভাই সুখেন্দু নিজের পছন্দমাফিক বিয়ে করে, তাকে বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরটি ছেড়ে দিতে হয়। ছোট ভাই নবেন্দুও বিয়ে করে চলে যাবে। তাদের বাবা অসুস্থ, হার্টের গোলযোগ, পেসমেকার বসাতে হবে। ভাইবোনেরা দায়িত্বজ্ঞানহীন, মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতিভূ। নায়ক এসে দাঁড়ায় তার প্রেমিকা ইনুর কাছে। এ-উপন্যাসের বিষয় আমাদের চারদিকের ভাঙন, বিপর্যয় ও বৈকল্য; মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলো সব মরে গেছে। এখানে হার্টের অসুখ সেই হৃদয়াবৃত্তির ক্ষয় ও তজ্জনিত সংকটের সূচক। গোটা দুনিয়াটাই কোনোক্রমে চলছে পেসমেকারের জোরে, হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার গভীর বেদনার মর্মস্পর্শী অনুভবে এখানে রূপক-উপন্যাসে এক শৈল্পিক মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবা-রাত্রির কাব্য সম্পর্কে ভাষ্যকার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে এটি 'একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক-কাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।' বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাসের নারী-পুরুষেরা সাংকেতিকতার রহস্য-আবরণে আবৃত। সকলের মধ্যে বিমূর্ততা ও অবাস্তবতার ছায়া। উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'দিনের কবিতা'য় হেরম্ব-সুপ্রিয়ার সম্পর্কের প্রকাশ। সুপ্রিয়া ভালবাসে হেরম্বকে, কিন্তু অভিভাবকের চাপে বিয়ে করে দারোগা অশোককে। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে অধৈর্য সুপ্রিয়া ঘর ছাড়তে চায় হেরম্বের সঙ্গে। হেরম্ব কিন্তু সুপ্রিয়ার আবেদনে সাড়া দেয় না। দ্বিতীয় পর্ব 'রাতের কবিতা'য় হেরম্বের কৌতূহল ও আকর্ষণ আনন্দের প্রতি। অনাথ ও মালতীর ব্যর্থ প্রণয়-ইতিহাস ও মালতীর মনোবিকারের জটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে আনন্দের সৌন্দর্য যেন ম্লান জ্যোৎস্না। তৃতীয় পর্ব দিবা-রাত্রির কাব্য-তে সুপ্রিয়া ফিরে এলে হেরম্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়। আনন্দ ও সুপ্রিয়া, এই দুই মেরুবাসিনীর মাঝে হেরম্ব দ্বিধা-সংশয়-অপরাধবোধে গ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানিকের এই ব্যতিক্রমী উপন্যাস তার মন্থর, আত্মবিশ্লেষণাত্মক, সাংকেতিকতার আলো-ছায়ায় অস্পষ্ট কাহিনিবিন্যাসে ও চরিত্র-চিত্রণের অর্ধস্ফুট রহস্যে রূপক উপন্যাস রূপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে।

উপন্যাসে রূপকধর্মিতার অপরাপর নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখযোগ্য বিমল করের যদুবংশ এবং লোকনাথ ভট্টাচার্যের বাবুঘাটের কুমারী মাছ।

(১৫) সামাজিক উপন্যাস (Social Novel) : সমাজ ও সামাজিক জীবন-বর্জিত, এমন কোনো উপন্যাস হয় না। জন্মলগ্ন থেকেই সমাজের সঙ্গে উপন্যাসের নাড়ির যোগ। ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক পটভূমিকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মৈত্রী ও বৈরিতার বহু বিচিত্র টানাপোড়েনে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাস-শিল্প বাঁক নিয়ে, মোড় ঘুরে চলেছে। তাই সেভাবে দেখলে সব উপন্যাসই হয়তো সামাজিক উপন্যাস বলে বিবেচিত হতে পারে।

তবে বিশেষভাবে যে উপন্যাসে সম্পূর্ণ বাস্তব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবরণ, বাধা ও বিক্ষোভ তথা সামাজিক সমস্যা ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, ফলত চরিত্রসমূহের মান-ভুলের ভাঙচুর ইত্যাদি প্রাধান্য পায় তাকে আমরা সামাজিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। রোমান্স বা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে এখানেই সামাজিক উপন্যাসের পার্থক্য। উপন্যাসের সঙ্গে সমকালের সম্পৃক্তি বাস্তব পরিবেশে ও লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরূপণে পরিস্ফুট হয় 'সামাজিক উপন্যাসে'। লেখকের সমকালীন সমাজজীবনের চিত্র, সামাজিক সমস্যা, বিশেষ ও বাস্তব সমাজ-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংকট ইত্যাদি সামাজিক উপন্যাসের উপাদান। অর্থাৎ সামাজিক উপন্যাস বাস্তববাদী উপন্যাস (Realistic Novel)-এর নামান্তর বিশেষ। এ-জাতীয় উপন্যাসে চরিত্রেরা অধিকাংশই টাইপধর্মী ও উপন্যাসের বাস্তবতা সমস্যায় আলোড়িত।

বাংলাভাষায় প্রথম উপন্যাসের শিরোপা দাবি করে যে নববাবুবিলাস (১৮২৫) সেটিতেই প্রথম বাংলা সামাজিক উপন্যাসের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল। কাহিনিবৃত্তের চরিত্র অপেক্ষা সমগ্র সমাজ-পরিবেশের চিত্রাঙ্কনই উপন্যাসকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য ছিলো। গদ্য-পদ্য, গুরুগম্ভীর শব্দসমাবেশ ও চটুল কথ্যরীতির এক আশ্চর্য সংকর ভাষায় উপন্যাসের সেই প্রারম্ভিক পর্বে বাবুসমাজের চরম পরিণতি দেখিয়েছেন ব্যঙ্গদর্শী ভবানীচরণ। একই বিষয়ে অনেক বেশি রসাশ্রিত সমালোচনা পাওয়া যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল-এ। বাবু সমাজের অমিতাচার, ইংরেজি আদবকায়দার অনুকরণ ও বানিয়া অর্থনীতির লোভলিপ্সার এক উপভোগ্য চিত্রাঙ্কন আলালের ঘরে দুলাল।

উনিশ শতকের বিদেশী শাসনাধীন সমাজ ও অর্থনীতির ভেতরকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার বহিরঙ্গের কাঠামোর এসবেরই প্রেক্ষাপটে এই সামাজিক উপন্যাসকে বুঝতে হবে। একদিকে সদ্যোজাত নাগরিক মধ্যশ্রেণী বিদেশী শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়াদি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে নতুন যুগের সংঘাত-সংশয়ে মুখর ও অস্থির জীবন-সাহচর্যে বাংলা গদ্য লাভ করেছিলো শক্তি ও সক্ষমতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) ও কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) পূর্ণাঙ্গ সামাজিক উপন্যাসরূপে সর্বজনস্বীকৃত। হয়তো ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব ও সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে লেখা পারিবারিক উপন্যাস হিসেবে কৃষ্ণকান্তের উইল শৈল্পিক সার্থকতায় অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত। জীবনে সমস্যা, সংকট, বিপর্যয় তো আছেই ; মানুষের সচেতন ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজের, আবার সমাজ ও পরিবারভুক্ত মানুষের মনের গভীরেও আছে দ্বন্দ্ব, দোটানা। এসবের মধ্যে দিয়েই তো মানুষকে দেখতে হবে। সেই দোটানা বিষবৃক্ষ-তে পাই : নগেন্দ্রনাথের দোলাচলে, একদিকে ব্যক্তিত্বশালিনী সূর্যমুখী আর অন্যদিকে কোমল, স্বপ্ন-সম্মোহিতা কুন্দনন্দিনীর আকর্ষণ। কৃষ্ণকান্তের উইল-এ সেই দোলাচল এক গভীর আবর্ত যেন ; শ্যামাঙ্গী অভিমানিনী ভ্রমর আর রূপসী লাস্যময়ী তৃষিতা রোহিণীর মধ্যবর্তী গোবিন্দলালের কঠিন দোটানা। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি সমাজে কিছু প্রশ্ন, কতিপয় সমস্যা, আদর্শঘটিত কিছু তর্ক জীবনকে মথিত করে তুলেছিলো, যেমন, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রেম ও দাম্পত্যের আদর্শ, বিধবার প্রেমের ও বিবাহের অধিকার ইত্যাদি। সেদিনের সমাজবাস্তবতার অনুগামী এইসব সমস্যা ও প্রশ্ন বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এ জায়গা করে নিয়েছে।

বঙ্কিমের এই দুটি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা সকলেই সামাজিক ও তাদের সময়ের গর্ভে জাত। বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর মোহে ভুলে ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথ পত্নী সূর্যমুখীর প্রতি ঔদাসীন্যে যে সংকটের জন্ম দিয়েছিলেন সে কাহিনির বহিরঙ্গে ছিলো বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। আর ছিলো নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্তদের উচ্ছৃঙ্খলতা। স্ত্রী ভ্রমরকে ছেড়ে গোবিন্দলালের বালবিধবা রোহিণীর রূপের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ও তার শোচনীয় পরিণতি সেই একই কাহিনির গভীরতর পুনর্নির্মাণ। বিবাহিতা স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করে অসংযত পুরুষের রূপজ মোহের আকর্ষণে ছুটে যাওয়ার এ-গল্প পুরোনো হলেও সমকালীন সমাজের চেতনা ও নৈতিকতা বঙ্কিমের উপন্যাসে তাকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছে।

সমাজচেতনা তথা বাস্তবতাবোধ আরো বিস্তৃতিলাভ করেছে দ্বিতীয় পর্যায়ের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে— রবীন্দ্রনাথের গোরা (১৯১০) এবং শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ (১৯১৬)-এ। উপন্যাসের কাল-সচেতনতার বিষয়টি, রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে

থাকে', সেই বাস্তবতার ঝিকটি প্রথম দেখা গিয়েছিলো চোখের বালি-তে, আর সেই সমাজমনস্কতার বহুস্তরান্বিত বিস্তার পাওয়া গেলো গোরা-য়। এ উপন্যাসে গোরা-সুচরিতার প্রেম অর্থ পেয়েছে শুধুই দুজনের ব্যক্তিস্বভাবে নয়, পেয়েছে সে-সময়ের আলোড়িত সমাজজীবনের পটভূমিতে। এই উপন্যাসেই আমরা পল্লীবাংলার এক বাস্তব চিত্র পেয়েছি—ইংরেজ শাসনের স্বরূপ, গ্রামবাসী মানুষদের দারিদ্র্য, দেশের জনজীবনের সত্য চেহারা। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যেকার মতদ্বৈধ এখানে গভীর চিন্তাশীলতায় আলোচিত হয়েছে। আবার দ্বন্দ্ব ও সংকট থেকে উত্তরণও এ-উপন্যাসে আভাসিত—হিন্দু পুনর্জাগরণের ভাবনা থেকে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকে মানবিক স্বদেশভাবনায় উত্তরণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে গোরা-র সামাজিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতার মূল বিষয়টি যথার্থভাবে চিহ্নিত : "ইহার ('গোরা'র) পাত্র-পাত্রীগণের যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন আছে তাহা নহে, আন্দোলন-বিশেষ বা ধর্মগত সংঘর্ষ-বিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের একটি বিরাট বৃহত্তর সত্তা আছে। বঙ্গদেশের একটি বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ-আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে।"

সামাজিক নিয়ম-কানুন-অনুশাসনের চাপে নিষ্পেষিত ব্যক্তিসত্তার যন্ত্রণা, বিশেষত নারীর ব্যক্তিসত্তার অন্তরায় সমাজ ও পরিবার—মোটামুটি এই বিন্যাসেই শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলি পাঠকহৃদয়কে খুব করুণভাবে ছুঁয়ে যায়, কখনো বা সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে পল্লীসমাজ-ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত সনাতন হিন্দু সমাজের নীতি ও আদর্শের আড়ালে যে দলাদলি, নীচতা ও কাপুরুষতা সমগ্র সমাজশরীরে ক্লেদ, গ্লানি ও পঙ্কিলতা ছড়িয়ে দিয়েছে তারই বাস্তব ও মর্মস্পর্শী চিত্র পাই পল্লীসমাজ উপন্যাসে। যে-সব নীতি ও আদর্শ প্রকৃত বিচারবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞানের দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে পারিবারিক তথা সামাজিক জীবন সুন্দর হতে পারতো, সুস্থ ধর্মজ্ঞান ও সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি বিকৃত হয়ে পড়ায়, সেইসব আনুষ্ঠানিকতার হৃদয়হীন স্বেচ্ছাচারে মানুষের জীবন হয়ে উঠলো বিষময়। কপট, অত্যাচারী সমাজপতিদের হীন স্বার্থপরতার শিকার হলো অসহায়, সমাজবদ্ধ নারী-পুরুষেরা। বেণী ও গোবিন্দ তাই এ-সমাজের নিয়ন্তা, আর রমেশ একঘরে। এরই ফলশ্রুতি রমা ও রমেশের প্রেম—সামাজিক ও বৈষয়িক স্বার্থ-সংঘাতের প্রেক্ষিতেই যাকে দেখা যেতে পারে, সার্থকতা পায় না। গ্রাম থেকে নির্বাসিত ও পশ্চিমের কোনো শহরে বড় হয়ে-ওঠা আদর্শবাদী রমেশ গ্রামে ফিরে এসে তার উন্নয়নের পরিকল্পনা করলে জাতিশত্রু বেণী ঘোষাল ও অন্যান্য মাতব্বরদের ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হতে হয় তাকে। এ-উপন্যাসে একদিকে রমেশ-রমার প্রেম, গ্রামের দরিদ্র মানুষ আর জ্যাঠাইমার আদর্শের জগৎ, আর অন্যদিকে ষড়যন্ত্রী মাতব্বর বেণী-গোবিন্দদের স্বার্থপরতা ও শয়তানি। প্রেমের কাহিনি এ-উপন্যাসে গ্রাম্য সমাজের সংকীর্ণতা ও চক্রান্ত তথা শোষণ-পীড়নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাছে যেন অনেকটাই গৌণ বলে মনে হয়। এ-উপন্যাসে সব চরিত্র ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার-পীড়িত পল্লীসমাজের বাস্তবতা।

পল্লীজীবনের করুণ বাস্তবতা নিয়ে উপন্যাস রচনার যে ধারা শরৎচন্দ্র প্রবর্তন করেছিলেন তার উত্তরাধিকার লক্ষ করা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা (১৯৪২) ও পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪)-এ। তবে সমাজজ্ঞানের বিশিষ্টতায় ও সমাজসৃষ্টির সচেতন বিস্তৃতিতে তারাশঙ্কর হয়তো বা শরৎচন্দ্রের থেকে অনেক বেশি আধুনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সময়ের নিদারুণ

আঘাত ও বিপর্যয়ে, মধ্যবিত্তের সঙ্কটাপন্ন অস্তিত্বের বহুমাত্রিক জটিলতায় সামাজিক তথা সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস নানা রূপে, আঙ্গিকে, নির্মাণরীতিতে উন্নীত হয়ে চলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বনফুলের জঙ্গম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহরতলি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠান প্রভৃতি নাম।

'সামাজিক উপন্যাস' বলতে আমরা মোটের ওপর বুঝবো সেইসব রচনাকে যাতে কোনো সামাজিক সমস্যা বা প্রশ্ন, বাস্তব সমাজচিত্র, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যক্তিমানসের দোলাচল ও বেদনা ইত্যাদি বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিবৃত ও বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সামাজিক উপন্যাস'কে দুটি গুণগত উপবিভাগে ভাগ করেছেন। এর একটিতে 'ঔপন্যাসিক প্রচলিত সমাজপটে প্রতিষ্ঠাভিত্তিকে আঘাত হানেন, যেমন থ্যাকারে', আর অন্যটিতে 'সমাজের পূর্বাহ্নির মূল্যগুলির ক্ষেত্রে নতুন প্রশ্নের উত্তরকে লেখক যাচাই করেন, যেমন জর্জ ইলিয়ট'। তবে উভয়ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বরূপকে রসগত বিশিষ্টতা দেন তাঁর সমাজবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র, অতঃপর বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, গোপাল হালদার, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়—এইভাবে বাংলা সামাজিক উপন্যাস তার উল্লেখযোগ্য মাইল ফলকগুলি রেখে গেছে অভিযাত্রী পাঠকের যাত্রাপথে। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের রোমান্স লক্ষণগুলির শৃঙ্খল খুলে ফেলে রবীন্দ্রনাথের গোরা ও চতুরঙ্গ বাংলা সামাজিক উপন্যাসকে মননশীল আধুনিকতার বিস্তৃতি দিয়েছিলো। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ ও গৃহদাহ-তে দেশ-কাল, সমাজ-সময়ের দ্বন্দ্ব নতুনভাবে মূর্ত হলো মানুষের সংস্কার, প্রেম, প্রবৃত্তি। আবার বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি ও আরণ্যক-এ পট ও প্রেক্ষিত বদলে গিয়ে ফুটে উঠলো সময় ও সময়ের এক ভিন্ন রূপাবেষ্য। বিশেষ অঞ্চলের মাটি ও মানুষকে নিয়ে সামাজিকতার অন্য এক মাত্রা এলো তারাশঙ্করের গণদেবতা কিংবা হাঁসুলিবাঁকের উপকথা-য়। মনঃসমীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের এক অসাধারণ নজির হিসেবে মানিকের পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুল নাচের ইতিকথা সূচিত করলো সমাজ-বাস্তবতার নতুন দিশা। বাংলা উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার এক নতুন ডিসকোর্স রচনা করলেন জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত্র মানস-এ সতীনাথ ভাদুড়ী, তিতাস একটি নদীর নাম-এ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, গঙ্গা-য় সমরেশ বসু এবং হাজার চুরাশীর মা ও অরণ্যের অধিকার-এ মহাশ্বেতা দেবী।

(১৬) কল্পবিজ্ঞানধর্মী উপন্যাস (Science Fiction) : বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য বা সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে অনাগত ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্পর্কে কল্পনানির্ভর গদ্য-আখ্যানকে এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে—"a prose story which explores the probable consequences of some improbable or impossible transformation of the basic condition of human (or intelligent non-human) experience." উদ্ভট, খেয়ালি-কল্পনা, রহস্য-রোমাঞ্চ এই জাতের উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সময়-যান বা টাইম মেশিনে চড়ে চলে যাওয়া দূর অতীত ও ভবিষ্যতে, গ্রহ-গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়া, অতি-জাগতিক (Extra-terrestrial) প্রাণী বা বস্তুর আবির্ভাব, বিজ্ঞানের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ও অভিযান এবং সেসব কিছু অবলম্বন করে দূরসম্ভব কল্পনার বিস্তার—এসব নিয়ে গড়ে ওঠে 'সায়েন্স ফিকশান'-এর আশ্চর্য জগৎ। কখনো কখনো কল্পবিজ্ঞানের রূপকে লেখক সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ব্যঙ্গমূলক, তির্যক ভাষ্যও রচনা করে থাকেন।

Scanned with CamScanner